বঙ্গ

কমলবার্তা

সেপ্টেম্বর সংখ্যা। ২০২৩। মূল্য ২৫ টাকা

চন্দ্রবিজয় থেকে জি২০

ভারতের মুকুটে দুটি পালক

যাদবপুরের শাপমোচন

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফল

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন প্রাসঙ্গিক কেন

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর একাত্ম মানববাদ

সংসদে বিপুল ভোটে মহিলা সংরক্ষণ বিল বা নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম গৃহীত হবার পর বিজেপির মহিলা সাংসদদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতের নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বঙ্গ
কমলবার্তা
সেপ্টেম্বর সংখ্যা। ২০২৩

চন্দ্রবিজয় থেকে জি২০ ৪
জয়ন্ত গুহ

যাদবপুরের শাপমোচন ৭
ডঃ জিষ্ণু বসু

যাদবপুর: বামপন্থার বিষকক্ষ ১১
অভিরূপ ঘোষ

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফল ১৩
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন প্রাসঙ্গিক কেন? ১৫
মনোরঞ্জন জোদ্দার

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর একাত্ম মানববাদ ১৮
দেবাশীষ চৌধুরী

ছবিতে খবর ২০

জেলার খবর ২৪

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি: সময়ের দাবি ২৬
কৌশিক কর্মকার

কাশীক্ষেত্রে জ্ঞানবাপী ২৮
বিনয়ভূষণ দাশ

নূহের সহিংসতা ৩১
সৌভিক দত্ত

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক: জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, উজ্জ্বল সান্যাল, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় বর্মা

সম্পাদকীয়

প্রথমবার ভারতের সভাপতিত্বে দিল্লিতে জি-২০ গোষ্ঠীর শিখর সম্মেলন নিয়ে বিরোধীদের কান্নাকাটি-অভিমান-অভিযোগ থাকলেও সব ম্লান হয়ে গেছে জি-২০ সম্মেলনের সাফল্য নিয়ে আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেনসহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দেশের ভূয়সী প্রশংসায়। স্বাভাবিকভাবেই 'জি-২০ সম্মেলনকে সামনে রেখে প্রচারের আলো নিজেদের দিকে টানতে চেয়েছে' বলে নয়াদিল্লিকে তোপ দেগেছে বেজিং। তবে সব সমালোচনা উড়িয়ে নরেন্দ্র মোদীর কূটনৈতিক মাষ্টারস্ট্রোকে জি-২০ সম্মেলনের মঞ্চে ভারত হয়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী এবং 'গ্লোবাল সাউথ'-এর সুপার পাওয়ার। ২০২৩-এর আগেও বিভিন্ন দেশে জি-২০ সম্মেলন হয়েছে তবে কূটনৈতিক মহলের মতে ভারতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এবারের জি-২০ সম্মেলনই সবচেয়ে সফল। সম্মেলনে ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ কানেক্টিভিটি করিডোরের ঘোষণায় বড় ধাক্কা চিনের। এই ঘোষিত অর্থনৈতিক করিডরের মাধ্যমে ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের গতি প্রায় ৪০% বেড়ে যেতে পারে। সম্মেলনে ভারতের প্রস্তাবিত, দীর্ঘ মেয়াদী জৈব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০-র স্থায়ী সদস্য করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে জি-২০ গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি দেশ। এবং গোটা বিশ্বকে অবাক করে ভারত মন্ডপমে অনুষ্ঠিত জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনে সমস্ত সদস্য দেশ ঐকমত্য হয়েছে নয়াদিল্লি ঘোষণাপত্র বা দিল্লি ডিক্লারেশন নিয়ে, ঘোষণাপত্রে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো সংবেদনশীল বিষয় থাকা সত্ত্বেও। সাধারণত এমন ঘটনা বিরল। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিশ্বমঞ্চে বহু প্রতীক্ষিত ভারতের এই বিশ্বজয়ের আগেই অবশ্য গোটা পৃথিবীর নজর কেড়ে নিয়েছিল ভারতের চন্দ্রবিজয়।

চন্দ্রযান ৩-এর আকাশছোঁয়া সাফল্য নিয়ে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস অবান্তর ও অনর্থক সমালোচনা করলেও গোটা বিশ্ব ভারতের চন্দ্রবিজয়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব যা সহজে বুঝতে পেরেছে সেটা কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসের মাথায় ঢোকেনি। আসলে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান ৩-এর সফল অবতরণ, ভারত সহ গোটা পৃথিবীর মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারতে। তবে একদিনে আসেনি এই সাফল্য। ভারতের 'মুন মিশন' নিয়ে অটল বিহারী বাজপেয়ীর স্বপ্নকে সাকার করতে অতিক্রম হতে হয়েছে বহু পথ।

একই কথা রাজনীতির ক্ষেত্রেও সমানভাবে মিলে যায়। কোনও সাফল্যই রাজনীতিতে হঠাৎ করে আসে না এবং উচিতও নয়। কখনও অভাবিত বিপর্যয় ঘটতে পারে, চন্দ্রযান ২-এর মতো। কিন্তু তারপরেও সাফল্য আসে। বাংলার কথাই যদি ধরি তাহলে একটা 'ধূপগুড়ি উপনির্বাচন'-এ খুব অল্প ব্যবধানে হেরে যাওয়া মানেই সব শেষ নয়, অন্তত রাজনীতিতে। অঙ্কে হেরে গেলেও রসায়ন অনেকসময় বড় বার্তা দেয় রাজনীতিতে। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের রাজনৈতিক রসায়ন কিন্তু বিজেপির পক্ষে। রাজ্য বিজেপির মোক্ষম চালে রাজ্যে ছত্রভঙ্গ 'ইন্ডিয়া' জোট এবং তৃণমূলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে রাজ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক বিকল্প ভারতীয় জনতা পার্টি। অঙ্ক মেলাতে ব্যস্ত তৃণমূল। রসায়নে বাজিমাত বিজেপির।

জয় হিন্দ।

চন্দ্রবিজয় থেকে জি২০

ভারতের মুকুটে সাফল্যের দুই পালক

জয়ন্ত গুহ

চন্দ্রযান-৩ এবং জি-২০ সম্মেলন সফল হবার কোনও কৃতিত্ব নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপি নিতে পারবে না— কংগ্রেসিদের গোঁ, আর তাতে পোঁ ধরেছে বামপন্থীরা। যদিও মহাকাশ গবেষণায় নরেন্দ্র মোদীর সংস্কারের ফলেই আজ চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্য এবং নরেন্দ্র মোদী তথা ভারত সরকারের প্রতি বিশ্বমঞ্চে অটুট আস্থা না থাকলে জি-২০-তে কি ইতিহাস নির্মাণ করতে পারত ভারত?

চন্দ্রযান-৩ এবং জি-২০ সম্মেলনে ভারতের সাফল্য নিয়ে সর্বত্র সবাই ভূয়সী প্রশংসা করেছে ভারতের। এমনকি বিবিসি এবং পাকিস্তানও বাধ্য হয়ে প্রশংসা করেছে। স্বাভাবিক। প্রশংসা করার মতোই কাজ করেছে ভারত! কিন্তু অবাক করার মতো বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ভাবনাচিন্তায় যাদের এগিয়ে রাখার কথা ছিল তাঁরা বাংলাভাষায় চন্দ্রযান-৩ এবং জি-২০ সম্মেলন নিয়ে যা লিখেছেন বা বলেছেন তা পড়লে বাঙালীকে পিছিয়ে যেতে হবে কয়েক লক্ষ মাইল। প্রশংসা তো দূরের কথা, চন্দ্রযান-৩ এবং জি-২০ সম্মেলনে ভারতের সাফল্য নিয়ে বলতে গিয়ে তাঁরা শুরু ও শেষ করেছে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে গালাগালি এবং বিষোদ্গার করে!

খুবই কম খরচে মাত্র ৬১৫ কোটি টাকায়, ২৩ আগস্ট ২০২৩ চাঁদের দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি পাখির পালকের মতো (সফট ল্যান্ডিং) চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে ভারতের চন্দ্রযান-৩, বলা ভাল চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস তৈরি করেছে ভারত। কেননা চাঁদে আগে অনেক অভিযান হয়েছে কিন্তু দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি ভারতই প্রথম চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে। চাঁদের মাটিতে চন্দ্রযান-৩-এর মূলত ৬টি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তাক লাগিয়ে দিয়েছে গোটা পৃথিবীকে। তার মধ্যে বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে দেওয়া অনুসন্ধান চাঁদের তাপমাত্রা নিয়ে।

এতদিন আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসা-র অনুসন্ধান

থেকে আমরা জানতাম, চাঁদের বিষুবরেখা বা মাঝামাঝি জায়গায় দিনের বেলায় তাপমাত্রা ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতে ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এবার এই প্রথম চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের পর বিক্রম ল্যান্ডার থেকে দিনের বেলায় চাঁদের মাটি (লুনার রেগোলিথ) ও মাটির ১০ সেমি (৪ ইঞ্চি) ভিতরের তাপমাত্রার যে পরীক্ষা চালানো হয় তাতে দেখা যায় মাটির ওপরে (টপ সয়েল) তাপমাত্রা ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস কিন্তু মাটি থেকে মাত্র ৮০ মিমি (৩ ইঞ্চি) নীচে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভারতের চন্দ্রযান-৩-এর এই অবাক করে দেওয়া অনুসন্ধানে গোটা পৃথিবীর বিজ্ঞানমহলের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, চাঁদের মাটি (লুনার রেগোলিথ) আসলে খুব ভাল একটি ইনসুলেটর, সহজ কথায় একটি ছাতার মতো চাঁদের ভিতরের মাটিকে রক্ষা করে তাপমাত্রা এবং রেডিয়েশন থেকে। তার মানে চাঁদে নিশ্চিন্তে নির্মাণ করা যাবে স্পেস কলোনি এবং এখন খুব পরিষ্কার চাঁদে মাটির নীচে জল (ওয়াটার আইস) আছে।

কিন্তু মহানিন্দুক বা নরেন্দ্র মোদীর যে কোনও প্রচেষ্টাকে বিরোধিতা করা যাদের স্বভাব তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, চাঁদে মাটি পরীক্ষা করে আমাদের কি কিছু হবে? দেশের কি বিকাশ হবে? সরকারের কোষাগারে টাকা আসবে? দেশের কৃষকরা কি হাতে চাঁদ পাবে?

অটল বিহারী বাজপায়ীর স্বপ্ন 'চন্দ্রযান প্রকল্প'-কে সফল করতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে নিঃশব্দে যে বিপুল সংস্কার হয়েছে তার ফলস্বরূপ, ২০২৫ সালের মধ্যে ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির পরিমাণ দাঁড়াতে পারে ১৩ বিলিয়ন ডলারে। চন্দ্রযান-৩ এর সরাসরি প্রভাব পড়বে অর্থনীতিতে। প্রাইভেট স্পেস সেক্টরে ভারতের আধিপত্য বাড়বে। এর ফলে মহাকাশ প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কর্মরত প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা বাড়বে। এর হাত ধরেই দেশে কর্মসংস্থান হবে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, কমিউনিকেশন, উপকরণ বিজ্ঞান এবং ইলেক্ট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের ক্ষেত্রে। মহাকাশ প্রযুক্তিতে বাড়বে সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ। সম্ভাবনা

রাজঘাটে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জি-২০-র শীর্ষনেতারা

বাড়ছে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বৃদ্ধিরও। পাশাপাশি মহাকাশ প্রযুক্তিতে ভারত যত শক্তিশালী হবে, সেই প্রযুক্তিই আবার কাজে লাগানো যাবে দেশের বিকাশ ও কল্যাণে। চন্দ্রযান-৩ অভিযানে চাঁদের মাটিকে বুঝতে ভারত যে এআইএমএল (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিং) প্রযুক্তি ব্যবহার করেছে সেই প্রযুক্তিই আগামী দিনে কৃষি ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বিকাশে আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে। আগামীদিনের ভারতে মহাকাশ প্রযুক্তি নিয়ে আসবে আনুষাঙ্গিক বহু অ্যাপ্লিকেশন যা বিপ্লব এনে দেবে পরিবহণ, টেলি যোগাযোগ এবং প্রাত্যহিক জীবনের মান উন্নয়নে।

আমেরিকার প্রখ্যাত বহুজাতিক (ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট) সংস্থা আর্থার ডি লিটল-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৪০ সাল নাগাদ ভারতের মহাকাশ অর্থনীতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১০০ বিলিয়ন ডলার, ১ ট্রিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতি। ২০২০ সালে

দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

দিল্লিতে 'ভারত মণ্ডপম'-এর প্রবেশ পথে অনন্য নটরাজ মূর্তি

নরেন্দ্র মোদীর কল্যাণময় ভাবনার পথে হেঁটে ভারত সরকারের প্রস্তাবে আফ্রিকান ইউনিয়নকে সর্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে জি-২০ মঞ্চে। 'গ্লোবাল সাউথ'-কে শক্তিশালী করতে জি-২০-এর মতো মঞ্চে আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী স্বপ্ন দেখেছিলেন ২০১৫ সাল থেকে।

নরেন্দ্র মোদী মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে শুরু করে বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতির বাজারে ভারতের শেয়ার। এই মুহূর্তে অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলা বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতির ২ শতাংশ ভারতের দখলে, শতাব্দী শেষে লক্ষ্যমাত্রা ৯ শতাংশ বাজার দখল করা। বর্তমানে ভারতের ৮ বিলিয়ন ডলারের মহাকাশ অর্থনীতি, গত কয়েক বছরে যা ৪ শতাংশ হারে বাড়ছে প্রতি বছরে। বিশ্ব মহাকাশ অর্থনীতির বাৎসরিক বৃদ্ধি হারের তুলনায় যা ২ শতাংশ বেশী। অভাবনীয় লাগলেও এটাই আজকের ভারত। নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত।

যে ভারতে নিজের হাজার বছরের হিন্দু সংস্কৃতিকে মিনমিন করে নয়, বুক চিতিয়ে প্রকাশ করা হয় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের অনুষ্ঠান মঞ্চ 'ভারত মন্ডপম'-এর প্রবেশপথে। চোল স্থাপত্যে তৈরি চোখধাঁধানো অষ্টধাতুর নটরাজ মূর্তি বসিয়ে। এই প্রথম অষ্টধাতুতে তৈরি হল ২৭ ফুট লম্বা এবং ১৮ কেজি ওজনের এত বিরাট এক নটরাজ মূর্তি। মাত্র ৭ মাসের মধ্যে রেকর্ড তৈরি করে নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এই সুবিশাল মূর্তি এবং এই অসাধ্যসাধন করেছেন তামিলনাড়ুর স্বামী মালাই শহরের রাধাকৃষ্ণন স্থপতি ও তাঁর সঙ্গী ৫০ জন শিল্পী। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মা— কসমিক এনার্জি বা শিবশক্তি, সৃজনশীলতা এবং শক্তির প্রতীক এই নটরাজ মূর্তি জি-২০ সম্মেলনে আসা রাষ্ট্রপ্রধানদের অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে জি-২০-র বিশ্বমঞ্চ থেকে এর থেকে জোরালো কূটনৈতিক বার্তা আর কী হতে পারে!

ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রতিটি কার্যকর্তার পক্ষ থেকে, জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা হার্দিক অভিনন্দন জানাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারত সরকারকে। সম্মেলনের বিশ্বমঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অনবদ্য নেতৃত্ব এবং মানবিক বিকাশের প্রতি প্রতিশ্রুতিময় উচ্চারণে আমরা গর্বিত। ভারতীয় কূটনীতির ইতিহাসে জি-২০ দিল্লি সম্মেলন এক বিরাট অধ্যায়। যুগান্তকারী এক মুহূর্ত তৈরি করে এই সম্মেলনেই বিশ্বমঞ্চে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারত।

নরেন্দ্র মোদীর কল্যাণময় ভাবনার পথে হেঁটে ভারত সরকারের প্রস্তাবে আফ্রিকান ইউনিয়নকে সর্বসম্মতিক্রমে স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া হয়েছে জি-২০ মঞ্চে। 'গ্লোবাল সাউথ'-কে শক্তিশালী করতে জি-২০-এর মতো মঞ্চে আফ্রিকার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী স্বপ্ন দেখেছিলেন ২০১৫ সাল থেকে। নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের প্রতি অটুট আস্থা আছে বলেই ইউক্রেন নিয়ে জি-২০ মঞ্চ বিভক্ত থাকা সত্ত্বেও অভাবিত ভাবে বিশ্বশান্তি ও বিকাশের কামনায় 'জি-২০ নয়াদিল্লি' ঘোষণা সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়েছে। সম্মেলনে ভারতের প্রস্তাবিত দীর্ঘ মেয়াদী জৈব জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে জি-২০ গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি দেশ। সম্মেলন চলাকালীন ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ কানেক্টিভিটি করিডোরের ঘোষণা, বর্তমান বিশ্বের বিকাশে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ঘোষণায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেওয়ার জন্য আমরা অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। জি-২০ সম্মেলন এর আগে বহুবার বহুদেশে হয়েছে কিন্তু এই প্রথম ভারতের ৬০টি শহরে ২০০ বৈঠকের আয়োজনে প্রকৃত অর্থে হয়ে উঠেছে 'পিপলস জি-২০' বা জনসাধারণের সম্মিলন।

সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা অর্থাৎ রাজ্য বিজেপির কার্যকর্তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী প্রজন্মকে এক গর্বের ভারত উপহার দিতে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই নতুন ভারত প্রতিদিন এগিয়ে যাবে বিকাশ, সহযোগিতা এবং বিশ্বগুরু হয়ে ওঠার পথে।

তথ্যঋণ:

১। Arthur D Little's report, India in Space: A USD 100 Billion Industry by 2040
২। সংস্কৃতি মন্ত্রক, ভারত সরকার
৩। নাসা, মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র, আমেরিকা
৪। ইসরো, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র

যাদবপুরের শাপমোচন

ডঃ জিষ্ণু বসু

অধ্যাপক গোপাল চন্দ্র সেনের কাপুরুষোচিত হত্যা, রানা বসুর শাস্তি না পাওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে এই ঘৃণ্য ঘটনার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ না হওয়া আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অসহিষ্ণু রাজনীতির জন্মলগ্ন। জাতীয়বাদের পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বামপন্থী অসহিষ্ণুতার হাড়হিম করা অভ্যাসের বিরুদ্ধে আজ ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।

স্বপ্নদীপ কুন্ডুর মৃত্যু রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। কী নিদারুণ নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছে ১৭ বছরের ছেলেটি। সকলে যাদবপুরের পরিবেশকে ধিক্কার জানাচ্ছে, গালি দিচ্ছে শিক্ষিত মানুষের এই নির্মম পাশবিকতার।

লোকে বলার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামেই খারাপ কথা বলছেন।

এই অপবাদ আমার মতো বহু সহস্র মানুষের বুকে শেলের মতো বিঁধছে। আমাদের কাছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় মাতৃসমা। মায়ের গায়ে কালি ছেটালে যেমন অনুভূতি হয়, যাদবপুরের অপবাদে আমার মতো অসংখ্য মানুষের মনে তেমনই অবস্থা হয়।

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, আগস্ট ১৯০৭

কিন্তু আমরা জানি যাদবপুরের যে ছবি সারা দেশের মানুষ দেখছেন, সেটা যাদবপুর নয়। যাদবপুরের এক দায়িত্বশীল, হৃদয়বান দিক লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যাচ্ছে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষা জগতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে। কিন্তু এই কৌলিন্য ছাড়াও এখানে অপূর্ব বাৎসল্য আছে, নিপাট বন্ধুত্ব আছে। আমি গ্রামের একান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু যাদবপুরের শিক্ষকেরা ক্লাসের পরেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইঞ্জিনিয়ারিং এর কঠিন বিষয় বুঝিয়েছেন কোনওপ্রকার অর্থনৈতিক লাভের আশা ছাড়াই। এখনও সারা পৃথিবীর কোথাও যাদবপুরের ছাত্র বা ছাত্রী, পরিচয় জানতে পারলে নিজের পরমাত্মীয়ের মতো আচরণ করে। আসলে এই যাদবপুরকে প্রচারমাধ্যম দেখায় না। দেখায় সেইটুকুকেই যার 'ন্যুইসেন্স ভ্যালু' আছে।

দ্বিতীয়ত যাদবপুরের যে বিশ্বজোড়া খ্যাতি তাতে এই নিষ্ঠুর, অসহিষ্ণু উগ্রতার কোনও অবদান নেই। একটি জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক গঠনমূলক ভাবনার স্রোত যাদবপুরে সতত প্রবাহিত হয়েছে। সেই শুভঙ্কর শক্তিই আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামের মহীরুহ তৈরি করেছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মের একেবারে শুরুর কথাগুলি বলা আজ বোধহয় বিশেষ প্রয়োজন। ১৮৯৫ ভবানীপুরে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন 'ভাগবত চতুস্পাঠী'। ১৮৯৭ সালে শুরু হল 'ডন' পত্রিকা আর ১৯০২ সালে 'ডন' সোসাইটি। এইসবের মধ্যে দিয়ে সূচনা হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊষা কাল। এরপর পর পর দুটি ঘটনা যাদবপুরের জন্মলগ্নকে ত্বরান্বিত করেছিল।

১৯০৪ সালে ইউনিভার্সিটি অ্যাক্ট, যাতে আদেশ দেওয়া হল যে দেশীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বা স্বদেশী উদ্যোগে কোনও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না। আর ১৯০৫ সালে কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আইন, যার বলে বাংলাকে ধর্মের ভিত্তিতে দুইভাগে ভাগ করে দেওয়া হল।

এই দুটি ঘটনা শিক্ষিত দেশপ্রেমিক মানুষের মনে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো কাজ করলো। ১৯০৫ সালেরই ডিসেম্বর মাসে ১০ তারিখে কলকাতায় ল্যান্ডহোল্ডারস অ্যাসোসিয়েশনের ডাকে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক-এর উপস্থিতিতে প্রায় ১৫০০ জন মানুষের সমাবেশ হয়। সেদিনই ঠিক হয়েছিল, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন হবে।

সেখান থেকে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ শুরু হল, বরোদার বহু টাকার চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে সেই শ্রী অরবিন্দ ঘোষ হলেন তার প্রথম প্রিন্সিপাল। ১৯০৫ সালের ১৫ আগস্ট শুরু হল কলেজ। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯০৬ সালে তৈরি করলেন বেঙ্গল টেকনোলজি ইন্সটিটিউট। তারপর স্যার তারকনাথ পালিতদের হাত ধরে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বেঙ্গল। শুরুর

দিনগুলি ছিল বাংলার অগ্নিযুগ। শ্রী অরবিন্দ ঘোষ তখন যুগান্তর, কর্মযোগীন আর বন্দেমাতরম সম্পাদনা করছেন। বন্দেমাতরম মামলার সময় অরবিন্দের বিরুদ্ধে কেস গঠনের পরিকল্পনা করছিল ইংরেজ পুলিশ। অরবিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দিলেন। ১৯০৭ সালে ২৩ আগস্ট তারিখে সেই ইস্তফাপত্র প্রত্যাহারের জন্য অনুরোধ করে একটি বিরাট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র, অধ্যাপক ও শহরের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন শিক্ষিত মানুষেরা। সেই সভায় ছাত্রদের উদ্দেশে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ বলেন, '...জাতির ইতিহাসে এমন কিছু সময় আশীর্বাদ হিসেবে আসে যখন সবকিছুই, যত গুরুত্বপূর্ণ আর উচ্চতর কাজ হোক না কেন, তাকে তুচ্ছ মনে করে বিসর্জন দেওয়া যায়। আমাদের মাতৃভূমির জন্য এমন একটি সময় আজ সমোপস্থিত যখন তাঁর সেবার থেকে বেশী প্রয়োজনীয় আর কিছু নেই, বাকি সব কিছু সেই অভিমুখেই ধাবিত হবে। যদি বিদ্যার্জন করো তবে দেশমাতৃকার জন্য করো, তোমার দেহ, মন আর আত্মা তাঁর কাজে নিয়োজিত করো। দেশের জন্য বাঁচার জন্য জীবন রচনা করো। যদি বিদেশে পড়তে যাও তবে অধিত জ্ঞান নিয়ে ফিরে এসে দেশে উন্নতিতে তার প্রয়োগ করো। এমন কাজ করো যাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁকে প্রফুল্ল করার জন্য কষ্ট সহ্য করো। এই একটি মাত্র উপদেশেই সবটুকু বিধৃত হল।'

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরে ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর ভারত সরকারের অনুমোদনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। এই পর্যায়ে ধীরে ধীরে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হল। অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন, গোপালচন্দ্র সেন আর অমিতাভ ভট্টাচার্যদের মতো প্রশাসক আর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর প্রজ্ঞা এটিকে সার্থক করেছিল। এটি ভারতের সম্ভবত একমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে অত্যন্ত অল্প আর্থিক সামর্থে, কেবলমাত্র অধ্যাপকদের আত্মত্যাগে বড় বড় প্রয়োগশালা আর ওয়ার্কশপ তৈরি হয়েছে।

এর মধ্যে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিৎ। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের ছেলে গোপালচন্দ্র সেন। মামাবাড়ি মেদিনীপুরে এসে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়ে ১৯২৯ সালে জেলে যান। যাদবপুর তখন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, বেঙ্গল। সেখানে চান্স পান। দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র থাকার সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি অর্থাভাবে হাওড়ার কারখানায় কাজ করে পড়াশুনা চালান।

গোপালচন্দ্র সেন আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে এম এস ডিগ্রি নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসেন। সেই সময় জেনারেল মোটরস কোম্পানি গোপালচন্দ্র সেনকে একটি চাকরি অফারও করেছিল। কিন্তু গোপালচন্দ্র সেন যেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দের বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। 'যদি বিদেশে যাও, তবে দেশের জন্য জ্ঞান নিয়ে ফিরে এসো।'

গোপালচন্দ্র সেন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক হয়ে ফিরে এলেন। পরে প্রধান হলেন, তারপরে ডিন অফ ফ্যাকাল্টি হয়েছিলেন। একান্ত ছাত্র দরদী ছিলেন গোপালচন্দ্র সেন। সেই জন্যেই হয়তো তাঁকে ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষের দায়িত্বও নিতে হয়েছিল। মেটাল কাটিং ও মেশিন টুলসের একাধিক পুস্তক লেখেন তিনি। অমিতাভ ভট্টাচার্য ও তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সূচনা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির যুদ্ধ যন্ত্রাংশ তৈরির কাজ করতো খিদিরপুরের 'ব্লু আর্থ ওয়ার্কশপ'। গোপালচন্দ্র সেনেরা গোটা কারখানাটাই তুলে নিয়ে এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রযুক্তিবিদ্যার ছাত্ররা হাতে কলমে শিখবে। সকালে থিওরিটিকাল ক্লাস আর বিকেলে ব্লু আর্থ এটাই তাঁর দিনচর্যা হয়ে ওঠে।

১৯৭০ সাল। কলকাতার অবস্থা উত্তাল। যাদবপুরের কিছু শিক্ষকই ছাত্রদের বোঝানো শুরু করলেন, 'যাবে খোল নলচে বদলে।' নিয়মিত ওই শিক্ষকেরা বাইরে থেকে কমরেডদের ডেকে আনতেন, আর বিপ্লবের প্রস্তুতির ক্লাস নিতেন। 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়', এ দেশের স্বাধীনতারই কোনও দাম নেই। তাই শিক্ষাব্যবস্থাও অর্থহীন। শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে অর্থহীন সেখানে পরীক্ষা নেওয়ারও মানে নেই। তাই ১৯৭০ সালে বাম ছাত্র সংগঠনগুলি ডাক দিল পরীক্ষা বয়কটের।

১ আগস্ট গোপালচন্দ্র সেন অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পেলেন। তিনি উদ্বাস্তু পরিবারের ছেলে। দারিদ্রের জন্য কারখানায় কাজ করে পড়াশুনা করেছেন। তিনি জানতেন একটা বছর নষ্ট হলে দরিদ্র ছেলেদের কী অবস্থা হবে। তাই গোপালচন্দ্র সেন বললেন, পরীক্ষা হবেই। যদি কেউ না দিতে চান তাহলে ছাত্রদের নিজেদের সে অধিকার আছে। কয়েক জন সাহসী শিক্ষকের সহায়তায় উপাচার্য পরীক্ষা ঠিকঠাক ভাবেই নিলেন। ফলও বের হল যথাসময়ে।

সে-বছরই তাঁর অবসর গ্রহণ। কিন্তু তিনি পুজোর ছুটি নিলেন না। ছুটিতে প্রতিদিন অফিসে গিয়ে ছাত্রদের রেজাল্ট দিয়েছিলেন। এটাই তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল। তিনি আদ্যোপান্ত জাতীয়তাবাদী হলেও নকশালপন্থী ছাত্রদের উপর পুলিশের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছিলেন। ছাত্রদের তিনি পিতার মতো ভালোবাসতেন।

কিন্তু চিনের 'সাংস্কৃতিক বিপ্লবের' প্রভাব কলকাতাতে দৃঢ়তর হচ্ছে। বিপ্লব মানে খুন। চিনে হাজারে হাজারে মানুষ খুন হচ্ছে। এদেশের মাটিতেও তাই করতে হবে। কারণ, 'চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান'। 'যাদবপুরের হস্টেলে এবং ক্যাম্পাসে এইসব বোঝানোর জন্য পার্টিক্লাস হত। বাইরে থেকে শিক্ষক আসতেন।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭০ গোপালচন্দ্র সেনের কর্মজীবনের শেষ দিন। তিনি উপাচার্য হিসেবে কোনও সুবিধাই নিতেন না। গাড়িও ব্যবহার করতেন না। সেদিন কাজ সেরে অরবিন্দ ভবন থেকে ফেরার সময় রানা বসু নামে একটি ছেলে পেছন থেকে ছুরি মেরে তাঁকে খুন করে। শ্রেণীশত্রু গোপালচন্দ্র সেনকে হত্যা করে বড়লোক ডাক্তার পিতার প্রভাব কাজে লাগিয়ে রানা কাপুরুষের মতো কানাডাতে পালিয়ে যায়।

গোপালচন্দ্র সেনের কাপুরুষোচিত হত্যা, রানা বসুর শাস্তি না পাওয়া ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরে এই ঘৃণ্য ঘটনার যথোপযুক্ত প্রতিবাদ না হওয়াই আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অসহিষ্ণু রাজনীতির জন্মলগ্ন।

অন্যের বক্তব্য রাখতে দেওয়া হবে না, নীতিহীন ভাবে বিরোধীদের শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করা এই পর্যায়ে শুরু হয়।

যেহেতু গোপালচন্দ্র সেনের হত্যাকারী বা হত্যার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত কেউই শাস্তি পায়নি, তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের অবচেতনে এই 'ন্যুইসেন্স ভ্যালুস'-এর প্রতি একটা গভীর ভীতি কাজ করে। হাতে গোনা কতিপয় বামপন্থী অধ্যাপক, কর্মচারী বা ছাত্রসংগঠনগুলি একাংশও এই অসহিষ্ণু উগ্র অতিবাম শক্তিকে নিজেদের কাজে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করেন, আর লোক দেখানো অতিবাম, বাম বা ফিকে বাম ইত্যাদি বিবাদের নাটক করেন।

চিনে শিল্পবিপ্লবে প্রায় ২০ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে মেরেছিলেন মাও সে তুং। তিনি যখন বীরের শিরোপা পেলেন তখন র‍্যাগিং করা বা র‍্যাগিং-এর মোকাবিলা করে স্মার্ট হওয়াটা যাদবপুর, দুর্গাপুর আর.ই. কলেজ বা শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির বা মেধাবী ছাত্রদের মধ্যে প্রচলন শুরু হয়। ইতিহাস সাক্ষী, কোনও অতি বিপ্লবী, বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনও জোরালো আন্দোলন করেনি। দুর্গাপুরে বা

গোপালচন্দ্র সেন-এর মৃত্যুর পর দক্ষিণ কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল, ১৯৭১

শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অতিবামপন্থা নিস্তেজ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাগিং-এর নিষ্ঠুরতাও কমতে থাকে।

রানা বসু থেকে স্বপ্নদীপের হত্যাকারী ছাত্রদের মধ্যে একটি বিষ প্রবাহ সতত চলছে। অতিবাম নেতৃত্বের পরিণত বুদ্ধির কিছু অধ্যাপক বা বহিরাগত সংগঠক স্নাতকস্তরের সুকুমারমতি ছাত্রদের মধ্যে ওইরকম ভয়ানক অসহিষ্ণুতার পাঠ দেন। এই ছাত্রদলের মধ্যে বেশিরভাগই রানা বসুর মতো উচ্চবিত্ত পরিবারের। এঁরা উত্তর আমেরিকার বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজেদের তৈরি করতে চান। অতিবামপন্থা এঁদের স্টাইল স্টেটমেন্ট হয়ে ওঠে। এঁরা নিজেরা পরবর্তী জীবনে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বা সর্বহারাদের জন্য কিছুই করেন না। ১৯৯৩ সালের ১৭ জানুয়ারি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের সামনে রামজন্মভূমি আন্দোলনের জন্য লিফলেটিং করছিলেন রানা মুখার্জি, রবিরঞ্জন সেন, অমিত দাস, সৌমিক মুখার্জি সহ অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের কিছু ছাত্র। রবিরঞ্জন তখন প্রেসিডেন্সির ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। অসহিষ্ণু বামপন্থীরা অমিতকে তুলে নিয়ে এসে কিছু অশিক্ষক কর্মচারীদের নিয়ে বেধড়ক মারে। মারের চোটে অমিত অজ্ঞান হয়ে যায়। অমিতকে বাঁচাতে বাকিরা ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকলে তাদেরকেও ঘিরে ফেলা হয়। অজ্ঞান অমিতকে ঘিরে তখন বিজয়োল্লাস করছে সেই অসহিষ্ণুর দল। সেদিন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ধনঞ্জয় দাস এসে উপাচার্যের ঘরে প্রতিবাদ করেছিলেন, 'এতো অসহিষ্ণুতা কেন?'

২০১৬ সালের ৬ মে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা বিবেক অগ্নিহোত্রীর চলচ্চিত্র 'বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম'-এর স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা করেছিল। বাইরের থেকেও প্রচুর ছাত্র, অধ্যাপক চলচ্চিত্র দেখতে এসেছিলেন। যাদবপুরের কর্তৃপক্ষ গোপালচন্দ্র সেনের হত্যার পর থেকেই অনেকসময়ই এই অসহিষ্ণু শক্তির ন্যুইসেন্স ভ্যালুকে ভয় পায়। তাই ছাত্রদের লিখিত ভাবে ড. ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের অনুমতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। এতে ছাত্ররা বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করে। সেদিন চিত্র পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রীর গাড়িতে লাথি মেরে, থুতু দিয়েছিল অসহিষ্ণু বামপন্থীদের দল। তারপরে রাত্রে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক দেবাশীষ চৌধুরীকে হেনস্থা করা হয়। সন্দীপ দাসের মতো ছাত্ররা বাধা দিতে গেলে তাদের মেরে অর্ধমৃত করে মাঠে ফেলে দেওয়া হয়। পরে সন্দীপ দাস সহ ৪ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বাঙ্গুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেদিনও কিন্তু অতি বা অনতিবাম কোনও শিক্ষক বা শিক্ষাকর্মী সংগঠন এই অসহিষ্ণু কাজের নিন্দা বা বিরোধিতা করেনি।

২০১৬ সালের ৬ মে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা বিবেক অগ্নিহোত্রীর চলচ্চিত্র 'বুদ্ধ ইন আ ট্রাফিক জ্যাম'-এর স্ক্রিনিং-এর ব্যবস্থা করেছিল। ড. ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামের অনুমতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

২০১৯ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ছাত্রদের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তাঁকে ঘিরে ধরে অসভ্যতা শুরু হয়। ভারতবর্ষের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে চুলের মুঠি ধরে টানা হয়। সেদিন কোনও বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন, কোনও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে বিশ্বাসী বাম ছাত্র সংগঠনও কি এর কোনও প্রতিবাদ করেছিল?

১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর, সোভিয়েত ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক পতনের পরে বামপন্থী ভাবনার অস্তিত্বের সংকট উঠে আসে। সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, বিশ্বজুড়ে যৌথখামার, শ্রেণী সংগ্রাম ইত্যাদি অর্থহীন হয়ে যায়। সেই জায়গা নেয় কালচারাল মার্কসিজম এবং ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের নিও মার্কসিজম-এর ভাবনা। গ্রামশি থেকে নোয়াম

চমস্কি জেএনইউ থেকে যাদবপুরের ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে যায়।

সমস্যার শুরু ইউরোপে। যেহেতু বুর্জোয়া আর প্রলেতারিয়েত, পুঁজিপতি আর সর্বহারা নেই, হ্যাভ আর হ্যাভনট নেই তাই বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটা দ্বিধাবিভক্ত সমাজ চাই, ওরা আর আমরা ভাবনার প্রয়োজন।

২০০৯ সালে প্রকাশিত পুস্তক 'টেকিং অন হেট: ওয়ান এনজিও-স স্ট্র্যাটেজিস' এই চক্রান্ত বিশ্লেষণের এক অনন্য দলিল। হেইডি বেইরিচের মতো রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিশারদরা বহুবার দেখিয়েছেন যে, কালচারাল মার্কসিজমের ধ্বজাধারীরা নারীবাদ, সমলৈঙ্গিক সামাজিক আন্দোলন, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এলজিবিটিকিউ-এর প্রচার, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের (ইউরোপে ব্ল্যাক ন্যাশানালিস্ট) সংগঠিত করতে। এই পর্যায়ে যাদবপুরে কাশ্মীরের কুখ্যাত উগ্রপন্থীদের এনে সম্মান দেওয়ার কাজ হয়েছে। সেই সব উগ্রপন্থীরা শত শত নিরীহ নাগরিকদের হত্যা করেছিল।

একই সঙ্গে কৃত্রিমভাবে সমলৈঙ্গিক সম্পর্কের পরিকল্পনামাফিক প্রচার ও বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একাংশ এই অসহিষ্ণু শক্তির কাছে বারবার আত্মসমর্পণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে এবছর (২০২৩ সালে) 'জেন্ডার নিউট্রাল ওয়াশরুম'-এর ব্যবস্থা হল। এটা আসলে কালচারাল মার্ক্সিজমের বিজয়ধ্বজা স্থাপন। স্বপ্নদীপকে জোর করে সমকামী প্রমাণের চেষ্টা এবং বিবস্ত্র করে হাঁটানোর পিছনে কাজ করেছে কৃত্রিমভাবে এলজিবিটিকিউ-এর পরিমণ্ডল তৈরির চেষ্টা।

কিন্তু এই শক্তি আসলে সংখ্যালঘু। এদের ন্যুইসেন্স ভ্যালুর জন্য সাধারণ সৃজনশীল ছাত্রছাত্রীদের কলরব চাপা পড়ে যাচ্ছে। জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের কথা জনমাধ্যমে উঠে আসছে না বা দেশপ্রেমিক অশিক্ষক কর্মীদের অকথিত ব্যথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় ওই অসহিষ্ণু বামপন্থী শক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ছবি ও পোস্টার ছিঁড়ে দিয়েছিল। সেদিন ছাত্র, অধ্যাপক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল এত বড় হয়েছিল যে বিগত দুই দশকে কেবলমাত্র ইউনিভার্সিটির সদস্য নিয়ে এমন সংখ্যা কখনও হয়নি। মিছিলের মাথা যখন গান্ধী ভবন ছুঁয়েছে তখন শুরুটা অরবিন্দ ভবনে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে কলকাতার কিছু নাম করা সংবাদমাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিনের উপর লাল কালিতে লেখা পোস্টারের খবর ছাপাতে আগ্রহী, কিন্তু বিবেকানন্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের প্রতিবাদকে তাঁরা 'নিউজ' মনে করেন না। স্বপ্নদীপের হত্যাকারীরা যে এতে উৎসাহ পান সেটা কি তাঁরা বোঝেন না?

এই অসহিষ্ণু বামপন্থী শক্তি ইউনিভার্সিটির মধ্যে গাঁজা, ড্রাগ ইত্যাদি বন্ধের প্রতিটি চেষ্টায় বাধা দিয়েছে। অধ্যাপক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন উপাচার্য হিসেবে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাতে বাধা দেওয়ার আসল কারণ এটাই ছিল। ড্রাগ অসহিষ্ণুতাকে বাড়ায়, যুক্তিবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ কমিয়ে দেয়।

আজ যাদবপুরের ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মহীরুহ তৈরি করেছেন জাতীয়তাবাদী মনীষীরা। আজও প্রতি বছর অধ্যাপক গোপালচন্দ্র সেনের স্মরণে ৩০ ডিসেম্বর সভা হয়। গোপালচন্দ্র সেন স্মারক বক্তৃতা হয় ফি বছর। গত মাসে (আগস্ট ২০২৩) প্রয়াত হয়েছেন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আর এক প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক মধুসূদন ভট্টাচার্য। ২০১৬ সালে গোপালচন্দ্র সেনের বলিদান দিবসে তিনি বলেছিলেন, 'যারা তাঁকে হত্যা করল, তারা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কী করেছে? কেউ হিসেব দিক তো!'

গোপালচন্দ্র সেনের মতো ঘটনা স্বাধীন ভারতে একমাত্র এমন জঘন্য লজ্জাজনক ঘটনা। শিক্ষার সম্মান রক্ষার তাঁর বলিদানের দিনটিকে জাতীয় স্তরে 'শিক্ষা রক্ষা দিবস' হিসেবে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পালন করার প্রয়োজনীয়তা আজ দেখা দিয়েছে।

দুর্ভাগ্য এই যে কলকাতার কিছু নাম করা সংবাদমাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিনের উপর লাল কালিতে লেখা পোস্টারের খবর ছাপাতে আগ্রহী, কিন্তু বিবেকানন্দের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের প্রতিবাদকে তাঁরা 'নিউজ' মনে করেন না।

১৯০৭ সালে শ্রীঅরবিন্দ ছাত্রদের মনে করিয়েছিলেন এই সাধনাস্থলের গৌরবের কথা, ত্যাগের আদর্শ, মহিমার বাণী—

'যখন অন্যান্য জীবিকা ছেড়ে আমরা এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করলাম, জীবনে অন্যবিধ সুযোগ পরিত্যাগ করে এই সংস্থার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করলাম, কারণ আমরা এর মধ্যে একটা ভিত্তিপ্রস্তর দেখেছিলাম, একটা জাতির কেন্দ্রবিন্দু, দুঃখ বা বিপদের তমশাচ্ছন্ন রাত্রির শেষে একটা নতুন ভারতবর্ষ যাত্রা শুরু হবে, যে উজ্জ্বল আর মহান দিনে ভারতবর্ষ সারা বিশ্বে নিজের অবদান রাখবে। এখানে আমরা কেবল তোমাদের সামান্য তথ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিনি, তোমাদের জীবনযাপনের সামান্য জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করার জন্য নয়, বরং দেশমাতৃকার কাজ করার জন্য যোগ্য সন্তান প্রস্তুত করার জন্য, আর তার জন্য কষ্ট সহ্য করার জন্য। এই কাজের জন্যই আমরা এই মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেছি...'

রবীন্দ্রনাথ গৈরিক অঙ্গবস্ত্রকে বলেছিলেন 'বৈরাগ্যের উত্তরীয়'।

আজও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনের অনুষ্ঠানে উপাচার্য আর দীক্ষান্তে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরা গৈরিক বর্ণের রোব পরিধান করে মুক্তমঞ্চে উপস্থিত হন। উপাচার্য শিষ্যকে দীক্ষান্তে প্রতিজ্ঞা করান, 'তুমি প্রাদেশিকতা, ধর্ম, জাতিভেদ বা গোষ্ঠীর ঊর্ধ্বে থেকে নিজের সর্বশক্তি দিয়ে দেশ ও জাতির সেবা করবে।'

শিষ্য অঙ্গীকার করে, 'হ্যাঁ আমি সেইরকম কাজই করব'।

আসলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তো জাতীয়তাবাদের পীঠস্থান। এই কালিমা কেবল সাময়িক।

বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সারা দেশের নবজাগরণের মশাল বহন করেছিল। আজকেও সেই জাগরণের আলোকশিখা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরা বহন করছেন। সারা দেশ সেই দিকেই তাকিয়ে আছে।

যাদবপুর: বামপন্থার বিষকক্ষ

অভিরূপ ঘোষ

যাদবপুর— হতাশাগ্রস্থ বামপন্থীদের মাস্তানি করার জায়গা হয়ে উঠেছিল। আদর্শহীন হবার হতাশা। মধ্য ও অতি বামদের ইউনিয়ন থাকলেও তাদের একসময়ের আদর্শ, গরীব-মধ্যবিত্ত মানুষের কল্যাণের ধারণা এখন সেখানে ব্রাত্য। যেখানে আদর্শহীন বিপ্লবের ঢুলুঢুলু স্পন্দন 'অবারিত নেশা আর অবাধ যৌনতা'র পাখপাখালিতে। জোরজুলুম এবং গুণ্ডামিতে। সঙ্গে তৃণমূলের অবাধ সমর্থনে তৈরি হয়েছিল এক বিষাক্ত পরিবেশ যার করুণ পরিণতি এক গরীব পরিবারের সন্তান স্বপ্নদীপের মৃত্যু।

যাদবপুর নিয়ে এযাবৎ কী দেখলাম আমরা? দেখলাম অকালে চলে গেল একটা নিরীহ প্রাণ, প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল হাজারো। শুরু হল একটা গোটা ইউনিভার্সিটিকে নিয়ে মিডিয়া ট্রায়াল। অবশ্য সেই মিডিয়ার ক্যামেরাতেই দেখা গেল যাদবপুরের ভেতরে সারিসারি মদের বোতল এবং একগুচ্ছ নোংরামির ছবি। দেখা গেল কোনো যুক্তি ছাড়াই সিসিটিভি-র বিরোধিতা। দেখা গেল 'চান্স পেয়ে দেখা' টাইপের এলিটসুলভ ঔদ্ধত্য। প্রশ্ন হল একটা গোটা ইউনিভার্সিটির সবাই কি এতে জড়িত! উত্তর অবশ্যই না। খাতায় কলমে যাদবপুরের স্টুডেন্ট স্ট্রেন্থ এখন সাড়ে তেরো হাজারেরও বেশি। আর মিছিলে বা তথাকথিত আন্দোলনে ক'জনকে দেখেন! মেরেকেটে পাঁচশো, বহিরাগত ও প্রাক্তনী সমেত। আর খেয়াল করলে দেখবেন যাদবপুরের নাম ডোবানোর খেলায় জড়িত প্রত্যেকেই বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি অন্যায়, প্রতিটি নোংরামি আর প্রতিটি গ্রেপ্তারে যাদের নাম পাবেন তারা হয় সরাসরি বাম নয়তো বাম দলের মুখোশে থাকা 'স্বাধীন ছাত্র সংগঠন'। আবার প্রশ্ন, জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় গড়ে ওঠা যাদবপুর, ঋষি অরবিন্দের যাদবপুর এইভাবে বামেদের নোংরা রাজনীতির দখলে চলে গেল কী করে! উত্তর পেতে গেলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে আমাদের।

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে বামেরা প্রথম যে জায়গায় আঘাত করে সেটা হল শিক্ষা। প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়া বা কম্পিউটার ঢুকতে না দেওয়ার মতো হাজারো আঘাতের চিহ্ন আজও বয়ে নিয়ে চলেছে রাজ্য। সেই পরম্পরা বজায় রেখেই উচ্চশিক্ষার রাশ পুরোপুরি নিজেদের হাতে তুলে নেয় আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। সমস্ত সিলেকশন কমিটির মাথায় নিজেদের লোক বসিয়ে সিপিএম এটা নিশ্চিত করে যাতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের অনুগত পার্টি ক্যাডারদের সর্বোচ্চ মাত্রায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। সেই ক্যাডাররা এরপর 'পার্টি ফার্স্ট, কমরেড সেকেন্ড আর স্টুডেন্ট লাস্ট' পলিসি নিয়ে ব্রেনওয়াশ করতে থাকে ছাত্রদের। অল্প কিছু সংখ্যক ছাত্র তাতে প্রভাবিত হয় আর বাকিরা ফাঁদ বুঝলেও কিছু বলার মতো জায়গায় থাকে না যেহেতু ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্স-পিএইচডি বা স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার চাকরি পেতে গেলে তখন পার্টির রেকমেন্ডেশন মাস্ট।

রাজ্যের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়েই এই ট্র্যাডিশন পুরোদমে চললেও যাদবপুরে এর প্রভাব হয় সর্বোচ্চ। যেহেতু যাদবপুরের স্নাতক থেকে পিএইচডি অবধি সবটাই হয় একই ছাতার তলায় তাই সেখানে বামেদের নিয়ন্ত্রণ হয় সর্বাধিক। ক্যাম্পাসের সাথে সাথে হস্টেলও চলে যায় তাদের দখলে। বহিরাগত নেতাদের এনে নতুন ছাত্রদের ব্রেনওয়াশিং, অবাধ নেশা-নোংরামি, দেশবিরোধী কার্যকলাপ এবং পাশ-আউট পার্টি ক্যাডারদের ভরণপোষণের জন্য নতুন ছাত্রদের থেকে নানা অছিলায় তোলাবাজি (যেমন নিজের প্রাপ্য হস্টেলে পঁচিশ টাকার জায়গায় বেডপিছু হাজার বারশো টাকা দিতে বাধ্য হওয়া) চলতে থাকে অবাধে। যেহেতু হোম ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা এবং তারপর চাকরির জন্য বাম ক্যাডার অধ্যাপক ও পার্টির উপর ভরসা করতে হত, তাই সিপিএমের নোংরামি দেখেও মুখ বন্ধ রাখা ছাড়া রাস্তা ছিল না একটা বড় অংশের ছাত্রদের।

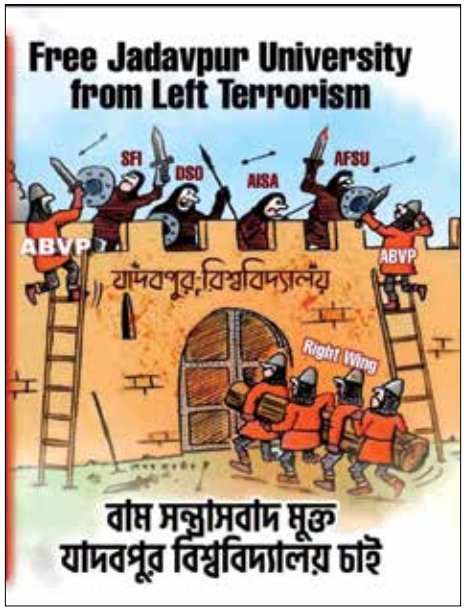

খেয়াল করলে দেখা যাবে মিটিং-মিছিল-আন্দোলনে সংখ্যাধিক্য থাকে কলা বিভাগের। অল্প কিছু থাকে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী। আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছেলেমেয়েরা এসব থেকে সাধারণত দূরেই থাকে। কারণটা স্পষ্ট— নির্ভরশীলতা। বিদেশে এবং অন্য রাজ্যে সুযোগ থাকায় ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ আর সায়েন্সের একটা বড় অংশ যেহেতু কর্মসংস্থানের জন্য পার্টিতন্ত্রের মুখাপেক্ষী থাকতে বাধ্য হত না, তাই তারা একটু দূরত্ব বজায় রাখত রাজনীতি থেকে (কলা বিভাগের প্রকৃত মেধাবী যারা পার্টি বা প্রফেসরের ভরসায় থাকত না তারাও রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রাখত)। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ওই দুই ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী বা অবামদের দখলে ছিল। ছিল না। এক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী এবং অবাম ছাত্র সংগঠনকে ক্যাম্পাসে থাকতেই দিত না সিপিএম। 'সহিষ্ণুতা', 'মুক্তচিন্তা' বা 'ধর্মনিরপেক্ষতার' মতো কিছু শব্দ ছিল ওদের অস্ত্র।

মনস্তত্ত্বের নিয়ম বলছে মানুষ নিজে আসলে যেমনটা, বাইরে সেরকম দেখাতে চায় না। উল্টে মানুষ প্রকৃতই যেরকম নয় নিজেকে সেরকম দেখানোর একটা প্রবণতা গড়পড়তা অনেকের মধ্যেই থাকে। যেমন বাড়িতে চলমান সিঁড়ি লাগানো আর দেশে বিদেশের ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা গচ্ছিত রাখা ভাইপো রাস্তার ধারের দোকান থেকে পাঁচ টাকার বিস্কুট কিনে নিজেকে গরীব দেখানোর চেষ্টা করেন। যেমন ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলা অসৎ সাম্রাজ্যের রাণী বড় বড় বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেকে সততার প্রতীক বলে প্রচার করেন। যেমন প্রবলভাবে অধার্মিক একটা মানুষ সরকারি পয়সায় ভাতা আর অনুদান দিয়ে নিজের ধর্মানুসারী মুখ (নাকি মুখোশ) দেখাতে চায়। ঠিক সেভাবেই কথায় কথায় সহিষ্ণুতার বুলি আওড়ানো যাদবপুরের কিছু ছাত্র পদে পদে আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে বিরুদ্ধ মতকে।

জাতীয় স্তরের বিখ্যাত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী নিজের সিনেমা 'বুদ্ধ ইন এ ট্রাফিক জ্যাম' নিয়ে গিয়েছিলেন যাদবপুর। গাড়ি ভাঙচুর করে তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করে একদল উন্মত্ত ছাত্রছাত্রী। এক ছাত্র ক্যাম্পাসে এবিভিপির লিফলেট বিলি করতে গেলে তাকে মারধর করে লেফট পার্টির মার্কামারা ক্যাডাররা। নিয়মিত বাধা দেওয়া হয় এবিভিপি আর বিজেপি যুব মোর্চার কর্মসূচিতে। ক্যাম্পাসে সরস্বতী পুজো বা রাম নবমী করতে গেলে বিপত্তি আসে কিন্তু ইফতার পার্টি চলে দিনের পর দিন।

পাঠক নিশ্চই বিস্মৃত হননি যে অকালে চলে যাওয়া স্বপ্নের গলায় একটা ঈশ্বর উৎসর্গীকৃত সুতোর মালা ছিল, যা নিয়ে তাকে আক্রমণ করতে ছাড়েনি বামপন্থী সিনিয়ররা। এখানেই শেষ নয়, উদাহরণ আছে ভুরি ভুরি। অবশ্যই ওই ছাত্ররা ব্যতিক্রমী কিছু করে না। পৃথিবীর ইতিহাস সাক্ষী, বামেরা ক্ষমতা পেলে একনায়কতন্ত্র আর স্বেচ্ছাচারিতা শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাকস্বাধীনতার ন্যূনতম জায়গা সেখানে নেই।

এরপর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বামেরা ক্ষমতা থেকে চলে গেছে বারো বছর হল। রাজ্যের প্রেক্ষিতে বিধানসভা আর লোকসভায় তারা শূন্য। তারপরেও কীভাবে তারা এই অরাজকতা চালাচ্ছে দিনের পর দিন?! উত্তর খুব সহজ। অধ্যাপক হওয়ার বা হায়ার এডুকেশন নেক্সাস চালানোর মতো শিক্ষিত লোক তৃণমূলে নেই। তোলাবাজি আর চুরি-দুর্নীতি ছাড়া তৃণমূলের লোকজন কিছু পারে না। অগত্যা জাতীয়তাবাদ আর বিজেপিকে আটকাতে তৃণমূলের ভরসা সেই সিপিএম।

পাটনা-বেঙ্গালুরু-মুম্বই যে ছবি দেখিয়েছে সিপিএম-তৃণমূল জোটের, যাদবপুর তার পূর্বসূরি হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। আর তাই যাদবপুরের পরিস্থিতি বদল হবার আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী শক্তি জায়গা পাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুকে। প্রত্যাশা যে খুব শিগগিরই আসতে চলেছে সেই দিন। প্রত্যাশা যে বামেদের নোংরামি থেকে খুব শিগগিরই মুক্তি পাবে বিশ্ববিদ্যালয়। প্রত্যাশা, খুব তাড়াতাড়ি যাদবপুর নিজের যোগ্যতার পূর্ণতা দিয়ে ঋষি অরবিন্দের আদর্শে হয়ে উঠবে ভারতসেরা।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফল

কোন কোন দিক উঠে এল?

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

গত জুলাই মাসের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধূপগুড়ি বিধানসভায় বিজেপি পায় ৩৯ শতাংশ ভোট। মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে বিজেপির প্রায় ৬ শতাংশ ভোট বেড়েছে। অন্যদিকে তৃণমূলের কমেছে ১ শতাংশ ভোট। পঞ্চায়েত ভোটে ঘাসফুল শিবিরের ঝুলিতে যায় ৪৭ শতাংশ ভোট এবং বিধানসভায় তা কমে হয়েছে ৪৬ শতাংশ। ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফলে একটা বিষয় দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, বিরোধী দল হিসেবে বিজেপিতেই রয়েছে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস।

গত ৫ সেপ্টেম্বর ধূপগুড়ি বিধানসভার উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, ফলাফল ঘোষণা হয় ৮ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় জনতা পার্টি প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পেয়েও জিততে পারেনি জলপাইগুড়ি জেলার এই আসন। তবে বিজেপির পক্ষে বেশ কিছু ইতিবাচক দিক উঠে এসেছে এই উপনির্বাচনের ফলাফলে।

উপনির্বাচনের এই ফলে একেবারে স্পষ্ট হয়েছে, বর্তমানে তৃণমূল বিরোধী দল হিসেবে রাজ্যের মানুষের মনে জায়গা অটুট রয়েছে বিজেপির। বিরোধী দল হিসেবে বিজেপিতেই রয়েছে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস। মানুষ এখনও মনে করছে, তৃণমূলকে সরানো একমাত্র বিজেপির পক্ষেই সম্ভব। অন্যান্য বিরোধী দলগুলির জোট ৬ শতাংশে নেমে গেলেও বিজেপি একাই রয়েছে ৪৫ শতাংশে। বাম-কংগ্রেস জোটের দ্বিচারিতা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাঁদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের নেতারা। একদিকে রাজ্যে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করার অভিনয় এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্তরে ঘাসফুল শিবিরের সঙ্গে মঞ্চ ভাগাভাগি। রাজ্যের মানুষের বুঝতে বাকি নেই তৃণমূলকে সরাতে বাম-কংগ্রেস জোট ঠিক কতটা আন্তরিক! মানুষের কাছে তৃণমূল বিরোধী দল হওয়ার সমস্ত রকম গ্রহণযোগ্যতা তাই হারিয়েছে বাম-কংগ্রেস শিবির।

অন্যদিকে গত পঞ্চায়েতের সাপেক্ষে যদি আমরা ফলাফল বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব ভারতীয় জনতা পার্টির ভোট বেড়েছে প্রায় ৬ শতাংশ। গত জুলাই মাসের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ধূপগুড়ি বিধানসভায় বিজেপি পায় ৩৯ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ মাত্র ২ মাসের ব্যবধানে বিজেপি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে প্রায় ৬ শতাংশ ভোট। অন্যদিকে তৃণমূলের কমেছে ১ শতাংশ ভোট, পঞ্চায়েত ভোটে ঘাসফুল শিবিরের ঝুলিতে যায় ৪৭ শতাংশ ভোট এবং বিধানসভায় তা কমে হয়েছে ৪৬ শতাংশ।

গণতন্ত্রের জোয়ারভাটায় বিজেপির ফল আগের নির্বাচনের সাপেক্ষে ভাল, একথা জোরের সঙ্গেই বলা যায়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলেন, উপনির্বাচনে সরকার বদলের কোনও সম্ভাবনা থাকে না তাই ফলাফল সাধারণত শাসক দলের দিকেই ঝুঁকে থাকে। এক্ষেত্রে নির্বাচনী ক্ষেত্রের মানুষজন নিজেদের স্থানীয় ইস্যুগুলির ওপর জোর দেন। ধূপগুড়ি আসনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। শাসক দলের পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতির নানা ফুলঝুড়ি ফুটতে দেখা গিয়েছে। বিগত ১২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকলেও ধূপগুড়িকে শাসক দল নানাভাবে বঞ্চিত রেখেছে। চা ও পর্যটন শিল্পের অনুকূল পরিবেশ থাকলেও তা কাজে লাগানো হয়নি কোনওভাবেই। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা সর্বত্র দেখা গিয়েছে অবহেলা। উপনির্বাচনের ফলাফলে যে রাজ্যের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন হয় না, সেটাও অনেকক্ষেত্রে দেখা যায়।

ধূপগুড়ির উপনির্বাচন তৃণমূলের জয়ের পরে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে দেখা গিয়েছে অভিনন্দন জানাতে। 'ইন্ডি' জোটের জয় হিসাবে দেখানো হচ্ছে তৃণমূলের জয়কে। বাম-কংগ্রেস শিবির 'ইন্ডি'জোটের অপর শরিক তৃণমূলকে জেতাতে কোনও গোপন আঁতাত যে করেনি, তা নিশ্চিতভাবে কেউই বলতে পারবেন না।

ধূপগুড়ি বিধানসভা উপনির্বাচনে জনসভায় বিজেপি প্রার্থী শ্রীমতী তাপসী রায়

যেমন ধরুন, উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর বিধানসভা উপনির্বাচন। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে বিজেপির বিপুল জয়ের পরেই গোরক্ষপুরের উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জিততে পারেনি বিজেপি। এই ফলাফল কিন্তু পরবর্তীকালে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশে প্রভাব ফেলতে পারেনি। কয়েকটি আসন কমলেও ঠিক ২০১৪ সালের মতোই গেরুয়া ঝড় আছড়ে পড়ে উত্ত রপ্রদেশে। তাই উপনির্বাচন যে পূর্ণ নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলে না, তা যেকোনও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই মেনে নেবেন। প্রসঙ্গত, ধূপগুড়ি বিধানসভা এলাকায় প্রায় ১২ হাজারের বেশি পরিযায়ী শ্রমিক বর্তমানে রয়েছেন ভিনরাজ্যে। রিপোর্ট বলছে, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এঁদের প্রায় আশিভাগ অংশ সরাসরি বিজেপিকে সমর্থন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, মাঠে নেমে বিজেপির জন্য প্রচার হোক অথবা রাস্তায় পতাকা টাঙানো কিংবা বুথে এজেন্ট বসার কাজ করেছিলেন, বড় অংশের এই ভূমিপুত্ররা, আজ যাঁরা রাজ্যের কর্মসংস্থানের বেহাল অবস্থার শিকার হয়ে ভিনরাজ্যে রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে করোনা পরিস্থিতির মধ্যেই বিধানসভা ভোট হয়েছিল। সেসময় পরিযায়ী শ্রমিকরা নিজের বাড়িতেই ছিলেন। পরবর্তীকালে রোজগারের সন্ধানে ফের তাঁদের ভিনরাজ্যে পাড়ি দিতে হয়। ২০২৩ সালের উপনির্বাচনে তাঁরা ভোটটাই দিতে পারলেন না। দেখা যাচ্ছে অন্যান্য বারের থেকে ধূপগুড়িতে মোট ভোটদানের হারও বেশ কমেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, যখনই ভোটের হার কম হয়, তখন তার লাভ শাসক দল পেয়ে থাকে। ধূপগুড়ির উপনির্বাচন আরও একাধিক তত্ত্বকে সামনে আনছে, তৃণমূলের জয়ের পরে কংগ্রেস হাইকমান্ডকে দেখা গিয়েছে অভিনন্দন জানাতে। 'ইন্ডি' জোটের জয় হিসাবে দেখানো হচ্ছে তৃণমূলের জয়কে। বাম-কংগ্রেস শিবির 'ইন্ডি'জোটের অপর শরিক তৃণমূলকে জেতাতে কোনও গোপন আঁতাত যে করেনি, তা নিশ্চিতভাবে কেউই বলতে পারবেন না। অন্যদিকে সারা দেশের নিরিখে উপনির্বাচনে জয়জয়কার হয়েছে বিজেপির। মুখ থুবড়ে পড়েছে বিরোধীদের তথাকথিত 'ইন্ডি' জোট।

ত্রিপুরাতে ধরাশায়ী হয়েছে বাম-কংগ্রেস জোট, সেখানকার ২টি আসনের (ধনপুর এবং বক্সানগর) উপনির্বাচনেই বিপুলভাবে জিতেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা। আবার উত্তরাখণ্ডেও দেখা গিয়েছে একই চিত্র। সেখানকার বক্সানগরে বিপুল ভোটে জিতেছে বিজেপি। বছর ঘুরলেই লোকসভা ভোট, বিগত ৯ বছর ধরে মোদি সরকারের জনমুখী কর্মসূচির যে সুফল গ্রামে গ্রামে পৌঁছেছে তার প্রতিফলন নিশ্চিতভাবেই লোকসভা ভোটে দেখা যাবে বলে মনে হয়। একথা পরিষ্কার, একমাত্র দল হিসেবে বিজেপি উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিমে দাপট দেখাচ্ছে। বিজেপির দাপটে পরস্পরবিরোধী দলগুলিও নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাসের বাতাবরণ রেখে এক ছাতার তলায় আসতে বাধ্য হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন প্রাসঙ্গিক কেন?

মনোরঞ্জন জোদ্দার

পশ্চিমবঙ্গ দিবস পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন। ২০ জুন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। তাই ওই দিনটিই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস। অন্য কোনও দিবসকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে মান্যতা দেওয়া যাবে না। ঘরে বাইরে রাজপথে আমরা রইলাম পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ জন্মদিন ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের জন্য।

ব্রিটিশ শাসিত ভারত, যুক্তরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারত ভেঙে দ্বিজাতি তত্ত্ব তথা ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হলে তৎকালীন ব্রিটিশ শাসিত কিন্তু মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ, বঙ্গ প্রদেশ ভাগ করে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সৃষ্টিতে সিলমোহর পড়ে। মুসলিম লিগের দেশভাগের প্রস্তাবকে সর্বাগ্রে সমর্থনকারী এবং ভারতকে টুকরো করার তত্ত্বে বিশ্বাসী (অধিকারী থিসিস) কমিউনিস্ট পার্টি ভারতভাগ এবং ১৯৪৭-এর বঙ্গভাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে দায়ী করে লাগাতার অপপ্রচার করে চলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে যে ঐতিহাসিক ঘটনার পারম্পর্য তা বর্তমানে চর্চা করা আবশ্যক।

আলীগড়ের আরবি মাটি থেকে যে দ্বিজাতি তত্ত্বের বীজ অঙ্কুরিত হয় তা অচিরেই কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে দাগিয়ে দেয়। আর কেবলমাত্র ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্টি হয় মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দল। আগ বাড়িয়ে আগা খাঁ মিশন মিন্টোর কাছে দরবার করে কেবল মুসলমান স্বার্থরক্ষার জন্য পৃথক নির্বাচক মন্ডলীর অধিকার আদায় করে নেয়। ভারতে এটাই প্রথম প্রশাসনিক সংরক্ষণ। মুসলিম লীগ বরাবর কংগ্রেস এবং হিন্দুদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চেয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এবং কংগ্রেসে কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলিম সামিল হলেও তা কোটিতে গুটিকয়েক। এম. কে. গান্ধি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক খিলাফৎ আন্দোলন সমর্থন করেন। খিলাফৎ মিটে যেতে হিন্দুরা পেল মোপলা, কোহাট সহ বিশগন্ডা দাঙ্গা। দেশানুগত্যের পরিবর্তে ধর্মানুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। অচিরেই লিগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে অধিকাংশই মুসলিম-লিগের সমর্থক হয়ে উঠল। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম লিগের এলাহাবাদ অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ নিয়ে মুসলমানদের আলাদা বাসস্থান গঠনের দাবি করলেন সভাপতি কবি ইকবাল। মুসলিম লিগের এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবহে, ব্রিটিশের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতির ভিত্তিতে এবং ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন অনুসারে ১৯৩৭ সালে যে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার ফলে বাংলার রাজনীতি এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক খাতে প্রবাহিত হয়।

১৯৩৭ সালে বঙ্গ প্রদেশের প্রাদেশিক আইনসভায় ২৫০

আসনের নির্বাচনে কংগ্রেস ৫৪, মুসলিম লীগ ৩৯, কৃষক প্রজাপার্টি ৩৫, ইনডিপেনডেন্ট হিন্দু ৩৭, ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম ৪২ ইত্যাদি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। অসাম্প্রদায়িক কৃষক প্রজাপার্টির ফজলুল হকের আবেদন সত্ত্বেও, কংগ্রেস সরকার গঠনে কোনও উদ্যোগ না নিয়ে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয় এবং সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগকে রাজনীতির খালি জমি ছেড়ে দেয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফজলুল হক লীগকে সঙ্গে নিয়ে সরকার গঠন করেন। এভাবে বাংলার প্রাদেশিক শাসনে সাম্প্রায়িক লীগ সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠা পেল। তথাগত রায়ের মতে— ১৯৩৭ সালের যে নির্বাচন হয়েছিল তাকে বলা যেতে পারে বাঙালী হিন্দুর সর্বনাশের শুরু। লীগ শাসনে হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে প্রথম সাংগঠনিক প্রতিবাদ করেন বাংলা আইনসভায় দুটি আসন পাওয়া হিন্দু মহাসভা দলের নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪০ এর ২৪ মার্চ মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে মুসলিমদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা বাসভূমির দাবি তুলল যা বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির চরম নিদর্শন। পরের মাসেই শ্রীহট্টে এক জনসভায় প্রথম প্রতিবাদ করেন শ্যামাপ্রসাদ। এরপর একাধিক জনসভায় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে এই ধরনের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে তিনি বক্তব্য রাখেন এবং এর মারাত্মক ধ্বংসাত্মক প্রবণতা বিষয়ে সতর্ক করেন।

১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। ইংরেজদের ভারত উপনিবেশের শাসন হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য কেন্দ্রীয়স্তরে ও প্রদেশগুলিতেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৬-এ বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক পাকরাষ্ট্রের দাবিতে (অবশ্যই সমগ্র বাংলা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে) ইস্তাহার প্রকাশ করে নির্বাচনে নামে। এই সময়ে কৃষক প্রজাপাটি অন্তর্দলীয় সংঘাতে দুর্বল। ইংরেজ লালিত লীগ হৃষ্টপুষ্ট গোঁয়ার ষন্ডে পরিণত। এই নির্বাচনে মুসলিম সংরক্ষিত ১১৭টির মধ্যে ১১৩টি আসন পায় মুসলিম লীগ। কংগ্রেস ৮৬। কে.পি.পি ৪, ইনডিপেনডেন্ট হিন্দু ১৩, ইনডিপেনডেন্ট মুসলিম ১, তপশীলি ও অন্যান্য ২৯। ফলাফল দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে অন্তত ৯৭/৯৮ শতাংশ বাঙালি মুসলিম ভারতভাগের পক্ষে (পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য) মুসলিম লীগকে সমর্থন করে ভোট দিয়েছে। ১৯৪৬-র জুলাইয়ে লীগনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্বে বঙ্গ প্রাদেশিক সরকার গঠিত হয়।

১৯৪৬ এর মার্চ। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মন্ত্রী মিশন ভারতে আসে। মিশনের সিদ্ধান্ত ছিল কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হবে যারা সংবিধান রচনা করবে এবং সেই সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে কিন্তু এই সরকারে যোগদান নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের বিবাদ বাঁধে। লীগ পাকিস্তান দাবি করে এবং পাকিস্তানের জন্য সংবিধান রচনা করতে চায়। পাকিস্তান দাবিতে অনড় লীগের সভাপতি জিন্নাহ ১৬ আগস্ট ১৯৪৬ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিলেন। সোহরাওয়ার্দীর পরিচালনায় লীগ সরকারের মদতে রাষ্ট্র পরিচালিত দাঙ্গা সংগঠিত হল। যাতে কয়েক হাজার মানুষ নৃশংস ভাবে হতাহত হয়। ১৯৪৬-এর অক্টোবরে নোয়াখালি, এরপর ঢাকা, রাজশাহী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ইত্যাদি স্থানে হিন্দুরা একতরফা ভাবে আক্রান্ত হল। লিগের প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রের ইংরেজ সরকার এবং কংগ্রেস কেউই হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে পারল না।

লীগ ও কংগ্রেসের মতানৈক্যে অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকর্মের অগ্রগতি না হওয়ায় ১৯৪৭-এর ২০ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে যে অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণে অসমর্থ হলে ব্রিটিশ সরকার প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে। বাংলায় লীগের সরকার থাকলেও পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লীগের সরকার ছিল না। এবারে লীগ ওই অঞ্চল থেকে হিন্দু ও শিখদের বিতাড়নের নীতি নেয়। ১৯৪৭-এর মার্চ মাসে পঞ্জাবে হিন্দু ও শিখ কাফেরদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু হয়। পাঞ্জাবের এই পরিস্থিতিতে সেখানকার সর্দাররা পাঞ্জাব প্রদেশ ভাগের দাবি তোলেন, কংগ্রেস এই প্রস্তাব সমর্থন করে। পাশাপাশি কংগ্রেসের পঞ্জাব ভাগের দাবি সমর্থনের মধ্যে ভারতভাগের একপ্রকার সম্মতি লক্ষ্য করে এবারে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা বাংলাভাগের দাবিতে সোচ্চার হয়।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন সমিতি সহ কিছু সংগঠনের প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বিজেপির সম্প্রতি গুরুত্বদানে বিস্তর অখুশি তৃণমূল মালকিন ও তার তাঁবেদার গন্ধগোকুল বুদ্ধিজীবীরা। তাই তাঁরা তাড়াহুড়ো করে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিনের অকালবোধনে নেমেছেন।

১৯৪৭-এর মার্চ মাসে ভারতে আসেন মাউন্টব্যাটেন। লক্ষ্য ১৯৪৮-এর ৩০ জুনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর। ২৪ এপ্রিল (১৯৪৭) মাউন্টব্যাটেনের একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে বাংলায় ৬০০ পুলিশ নিয়োগের অনুমোদন দিলে সোহরাওয়ার্দী সবগুলি পদে মুসলিম এবং প্রাক্তন সেনা নিয়োগের নির্দেশ দেন। বাংলায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়ায় সব পঞ্জাবি মুসলিম নিয়োগ করা হয়। বাংলার পুলিশ ব্যবস্থা নিয়ে মাউন্টব্যাটেন উদ্বেগ প্রকাশ করেন। যাইহোক ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে বিভিন্ন দলের সঙ্গে মাউন্টব্যাটেন আলাপ আলোচনা শুরু করেন।

১৯৪৭ সালের ৪ এপ্রিল থেকে ৬ এপ্রিল, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার তারকেশ্বর কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। এখানে নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে বলেন ‘as the Muslim League persists in its fantastic idea of establishing Pakistan in Bengal, the Hindus of Bengal must constitute a separate province under a strong National Government.’ তারকেশ্বর সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদকে বাঙালি হিন্দুর পৃথক হোমল্যান্ড প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী সমিতি গঠন করতে বলা হয়। সারা বাংলায় অক্লান্ত পরিশ্রম করে শ্যামাপ্রসাদ শত শত সভা করে হিন্দুদের সংগঠিত করেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় হিন্দুমহাসভার একমাত্র সদস্য শ্যামাপ্রসাদ আইনসভার হিন্দু সদস্যদের নিকট আবেদন রাখলেন, কংগ্রেসীরা তার পাশে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়াল বাংলার হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা, সমর্থন করল সাধারণ হিন্দু জনগণ।

প্রসঙ্গত ৫ জুলাই, ১৯৪৭ কংগ্রেস (বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস) বাংলা ভাগের প্রস্তাব নেয়। সেখানে বলা হয় সরকার যদি প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তবে বাংলার যে অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়, সেই অংশে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ অত্যন্ত আগ্রাসীভাবে দাবি করেন যে, 'এই পৃথকীকরণ এখন আর পাকিস্তানের উপর নির্ভর করছে না। পাকিস্তান যদি গঠিত নাও হয় বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে একটি নতুন রাজ্য তৈরির দাবি থেকে আমরা সরছি না।'

১৯৪৭-এর ২০ এপ্রিল শ্যামাপ্রসাদ মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী যদি ক্ষমতা হস্তান্তর না হয় তাহলে বাংলা ভাগ করতে হবে। ওই একই দিনে অবশ্য জিন্নাহও এসে মাউন্টব্যাটেনকে জানিয়ে যান প্রদেশ ভাগ কতটা বিপজ্জনক হবে। সবদিক অনুধাবন করে মাউন্টব্যাটেন শেষ পর্যন্ত জিন্নাহকে জানিয়ে দেন, যে যুক্তিতে জিন্নাহ ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানদের ধর্ম সংস্কৃতি নিরাপত্তার জন্য পাকিস্তান চাইছেন সেই একই যুক্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগ করে হিন্দুদের দাবি প্রতিষ্ঠা পাওয়া উচিত। বাংলা ভাগ নিশ্চিত দেখে লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল রহমান, আবুল হাসিম প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতারা এবং বাংলার গভর্নর বারোজ এক নতুন খেলা শুরু করেন। তাঁরা বাংলা প্রদেশ কংগ্রেসের শরৎ বসু ও কিরণ শঙ্কর রায়কে হাত করে স্বাধীন বাংলা (অর্থাৎ যেটা পাকিস্তান বা ভারত কোনও অংশেই যুক্ত হবে না) এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা আসলে ছিল এক ষড়যন্ত্র।

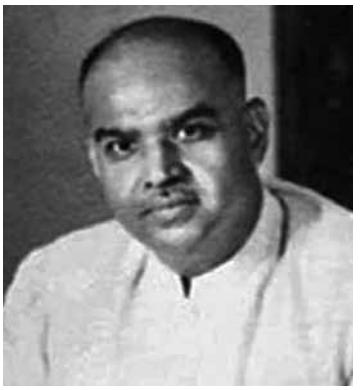

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

যেখানে দেশভাগ অনিবার্য সেখানে পাকিস্তান হতে যাওয়া ভূখণ্ড থেকে খানিকটা জমিকে (পশ্চিমবঙ্গ) রক্ষা করে ভারতের সাথে যুক্ত করার অসাধ্য কাজ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। আর বিশেষ করে ১৯৩৭-৪৭ (মাঝে একবছর বাদে) লীগের অপশাসনে হিন্দুর দুর্দশা দূর করার জন্য শ্যামাপ্রসাদের এই পরিকল্পনা ছিল। বলা উচিত পাকিস্তানকে ভাগ করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তাঁর পরিকল্পনা সমর্থন করেন তৎকালীন বাংলার বিশিষ্টরা। যদুনাথ সরকার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শিশির মিত্র, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পৃথক প্রদেশ গঠনকে সমর্থন করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার গ্যালপ পোল-এর সমীক্ষায় দেখা যায় হিন্দু ভোটদাতাদের ৯৮% বাংলায় পৃথক রাজ্য গঠনের পক্ষে। এছাড়া আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় সামিল হয়েছিল।

অবশেষে এল বহু প্রতীক্ষিত সেই দিন ৩ জুন। মাউন্টব্যাটেনের সভাপতিত্বে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে বাংলা ও পঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত হয়। বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সমস্ত সদস্যরা বিধানসভায় মিলিত হন। ২০ জুন বাংলাভাগ কার্যকরী করতে পশ্চিমবঙ্গ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি এবং পূর্ববঙ্গ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি গঠিত হয়। এই ২০ জুন দিনটিতেই কার্যত পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয় ও স্বীকৃতি পায়। তাই ওই দিনটিকেই পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে জাতীয়তাবাদীরা মর্যাদা দিচ্ছেন।

এই ঘটনাক্রম থেকেই বোঝা যাচ্ছে কীভাবে বঙ্গ প্রদেশ ভেঙে হিন্দু সুরক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ গঠন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। বাংলাভাগ ধর্মের ভিত্তিতে হয়েছে তবে হিন্দু-মুসলিমের ভিত্তিতে নয়, মুসলিম অমুসলিমের ভিত্তিতে। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতে পশ্চিমবঙ্গ গঠন ছিল সময়োচিত ও যুক্তিযুক্ত। পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হলে বঙ্গের অমুসলিমদের ভবিতব্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়া। বিকল্প ছিল স্বাধীন যুক্তবঙ্গ। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই দাঙ্গা করে হিন্দুদের তাড়ানো হত, এই সিদ্ধান্তে আসতে বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। দাঙ্গা করে হিন্দুদের তাড়ানো হত না তার গ্যারান্টি কি কেউ দিতে পেরেছিলেন?

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দিবস বা পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি আলোচনার গুরুত্ব কী? গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা এখানে যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল। এটা বাঙালী হিন্দুর একমাত্র হোমল্যান্ড, অবশ্যই এখানে সংবিধান মোতাবেক সবাই বসবাস করবেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ভিত্তি ছিল হিন্দুর স্বার্থ, নিরাপত্তা ও বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতি রক্ষা। বর্তমানে সেখানে বেশ কিছু জেলায় অতিরিক্ত মুসলিম জনসংখ্যা দেখা যাচ্ছে। জন্মহার দিয়ে যার ব্যাখ্যা করা যায় না। এর একমাত্র ব্যাখ্যা মুসলিম জনগণের পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশ থেকে অবৈধ অনুপ্রবেশ। সীমান্তবর্তী দশ কিমি এলাকায় অতিরিক্ত মুসলিম জনঘনত্ব। যেখানে মৌলবাদী জামাতিরা এসে ঘাঁটি গাড়ছে; বোমা কারখানা, খারিজি মাদ্রাসা তৈরি করছে রমরমিয়ে। এটা পরিকল্পিতভাবে জনবিন্যাস পাল্টে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ দখলের ষড়যন্ত্র নয় তো?

২০১১-২০২০ সালের মধ্যে নলিয়াখালি কালিয়াচক, ধুলাগড়, উস্তি, নৈহাটি, চন্দননগরে দাঙ্গার ঘটনা ঘটেছে। ১৯১৯-এর ডিসেম্বর মাসে এই পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকতা প্রদান আইনের (CAA) বিরুদ্ধে ট্রেন, বাস, সরকারি সম্পত্তি পোড়ানোর তিনদিনের ট্রেলার নিশ্চয়ই কেউ ভুলে যাননি। ১৯৪৬-র সোহরাওয়ার্দীর মতোই এই হিংসাত্মক দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিতে নীরব দর্শক ছিল তৃণমূল ও জামাতি উলেমায়ে হিন্দ জোটের শাসক সরকার। এখানে দাবি উঠেছে কলকাতার মেয়র অথবা নগরপাল মুসলিম হতে হবে। দাবি পূরণ হয়েছে। বিমানবন্দরের কাছে হজ হাউস হয়েছে। ১৯৪৭-এর ২০ জুন হিন্দু সৃষ্ট বিধানসভা এখন আইন করে আলাদা মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে মুসলিম তোষণের রাস্তা করেছে। শিক্ষায় নির্লজ্জ ইসলামীকরণ ঘটছে।

পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন সমিতি সহ কিছু সংগঠনের প্রচেষ্টায় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ বিজেপির সম্প্রতি গুরুত্বদানে বিস্তর অখুশি তৃণমূল মালকিন ও তার তাঁবেদার গন্ধগোকুল বুদ্ধিজীবীরা। তাই তাঁরা তাড়াহুড়ো করে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিনের অকালবোধনে নেমেছেন। ঘোষণা করেছেন পয়লা (বা পহেলা) বৈশাখকে নাকি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে তাঁরা পালন করতে চান।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দিবস পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন। ২০ জুন এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম। তাই ওই দিনটিই একমাত্র যুক্তিগ্রাহ্য পশ্চিমবঙ্গ দিবস। অন্য কোনও দিবসকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসাবে মান্যতা দেওয়া যাবে না। ঘরে বাইরে রাজপথে আমরা রইলাম পশ্চিমবঙ্গের যথার্থ জন্মদিন ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের জন্য।

পণ্ডিত দীনদয়ালজীর একাত্ম মানববাদ

দেবাশীষ চৌধুরী

দীনদয়ালজীর একাত্ম মানববাদ সম্পূর্ণ ভাবে ভারতীয়। যা মার্ক্সবাদ বা নেহরুবাদের মতো বিদেশী, ভারতের পরিপন্থী নয়। তাঁর ভাবনায়, ভারত সবকিছুকেই একাত্ম করার ক্ষমতা রাখে। পশ্চিম যেখানে সবসময়ই বলার চেষ্টা করে যে 'এটাই সত্যি একমাত্র এটাই সত্যি', আমরা ভারতীয়রা আমাদের সনাতন ধর্মের চেতনা থেকে উপরন্তু বলে থাকি, 'এটা যেমন সত্য ওটাও সত্য। যত মত তত পথ'।

ভারতীয় পরিচয় মানে কী? প্রত্যেক জাতির কিঞ্চিৎ কিছু মৌলিক পরিচয় থাকে, যেমন রাশিয়ানরা হচ্ছে শীতকাতর অত্যন্ত সহনশীল জাতি, আবার জার্মানদের পরিচয় কঠোর পরিশ্রমী এবং কার্যদক্ষ। এইরূপ ভারতীয়দের অর্থাৎ আমাদের মৌলিক পরিচয় কী? পণ্ডিতজী এই বিষয়ক গভীর গবেষণা করেন। ওঁর দেওয়া সিদ্ধান্তকেই আমরা 'একাত্ম মানববাদ' বলে জানি। ওঁর সিদ্ধান্তের মূল কথা হচ্ছে 'শীল দয়া পরোপকার মানবকল্যাণ সহিষ্ণুতা ধর্ম জ্ঞান চেতনা ও বিবেক' ভারতীয়দের মৌলিক পরিচয়।

পণ্ডিতজী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর জন্য ঋষি অরবিন্দ এবং বিবেকানন্দকে উদ্ধৃত করেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'ভারত ধর্ম দ্বারা চালিত হয়'। অরবিন্দ বললেন, 'ভারত একটি সভ্যতার স্রোত যার উদ্দেশ্য মানব কল্যাণ'। পণ্ডিতজী সম্মিলিত ভাবে বললেন, 'ভারতের আত্মা মানবতা আর এটাই ভারতের ধর্ম'। ভারতে ব্যক্তি পরিবার সমাজ দেশ ধর্ম রাষ্ট্র আর রাজনীতির মধ্যে যেই যোগসূত্রগুলো আছে সেটা পাশ্চাত্যের (আরব সহ) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, পুরো উল্টো'।

পশ্চিমে যেখানে খ্রিস্টান ইসলাম আর কমিউনিজম-এর অবধারণাগুলো প্রাধান্য পেয়েছে সেখানকার মূল জীবনদর্শন হচ্ছে— প্রতিস্পর্ধা, সংঘর্ষ এবং সাম্রাজ্য বিস্তার। এই বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে

উনি বলেন, পশ্চিমে ব্যক্তিকে যদি বড় হতে হয় তাহলে তাকে নিজের ভাইকেই অপদস্থ করতে হবে (Darwin-এর সিদ্ধান্ত)। এরপর যদি কোনো কুটুম্ব পরিবারগোষ্ঠী-কে বড় হতে হয় তাহলে ওদের অন্যান্য জনগোষ্ঠীগুলিকে সংহার করতে হবে। অতঃপর কোনও জাতি দেশ রাষ্ট্রকে যদি বড় হতে হয় তাহলে ওই দেশকে অন্য দেশগুলোকে পরাজিত করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে এগোতে হবে! একইভাবে যদি কোনো 'যুগ' কে বিজয়ী হতে হয় তাহলে ওই যুগকে নিজের সময়ের আগের সমস্ত অতীত যুগগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। অর্থাৎ পুত্রকে বড় হওয়ার জন্য নিজের মাতাপিতাকে বাদ দিতে হবে!

পণ্ডিতজী এখানেই বললেন ভারত এই মানসিকতার একদম বিপরীত। পশ্চিম যেখানে সবসময়ই বলার চেষ্টা করে যে 'এটাই সত্যি একমাত্র এটাই সত্যি', আমরা ভারতীয়রা আমাদের সনাতন ধর্মের চেতনা থেকে উপরন্তু বলে থাকি, 'এটা যেমন সত্য ওটাও সত্য। যত মত তত পথ'। পশ্চিম তাই 'হি মতবাদে গ্রসিত' (হিন্দি তে यह ही = এটাই सिर्फ यह ही = একমাত্র এটাই, শুধু ही = হি ही = হি তাই 'হি' মতবাদ) অপর দিকে আমাদের উদার চিন্তন হচ্ছে 'ভি মতবাদ' (হিন্দি তে यह भी = এটাও वह भी = সেটাও, সবই ঠিক। অর্থাৎ भी =ভি, আর তাই 'ভি' মতবাদ)।

'ধর্ম স্থাপনের' জন্য, পুরাতনকে ছুঁড়ে ফেলার জন্য নয়। ভারতীয় রাজনীতি যে সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে, 'সর্বজন হিতায় সর্বজন সুখায়'। রাম রাজ্যের মানে রাজা রামের রাজত্ব নয় বরং আদর্শ ধর্ম রাজ্য। সেই ধর্ম রক্ষার জন্য রাজনীতি যেখানে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন হচ্ছে পরম দায়িত্ব।

পণ্ডিতজী তাই বললেন, ভারতে গণতন্ত্র স্বাভাবিক প্রকৃতি। ভারতের মানুষ জাতিগত ভাবে গণতান্ত্রিক আর তাই স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার হয় ওঠে। ধর্ম শাসন মানে গুরুকুল চালাচ্ছেন এমন একজন ত্যাগী ঋষি গুরুর শাসন। কেননা রাজার একজন গুরু থাকতেই হবে এবং সেই গুরুর দায়বদ্ধতা রয়েছে রাজা নয় রাজ্যের কল্যাণের প্রতি, যথা কৌটিল্য আর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। কেননা 'রাজগুরু' ঋষি এবং তার ক্ষমতার ভিত ধর্মজ্ঞান আর সত্য কিন্তু রাজদন্ড নয়।

এই প্রকার যখন ভারত নিজের মূল চরিত্র মূল পরিচয় সহ আত্মপ্রকাশ করে আত্মবিশ্বাস সহ আত্মনির্ভর হয় উঠবে, তখন ভারতের 'চিতির' উদয় হবে। 'চিতির' তত্ত্ব পণ্ডিতজীর রাজনৈতিক দর্শনের মূল। চিতি মনে সেই মুহূর্ত সেই ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ যখন কোনও জাতি নিজের মৌলিক স্বভাব সহকারে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে। সেই মুহূর্তে সেই জাতি নিজের মৌলিক পরিচয় সম্পূর্ণ মানবতাকে

'কচ্ছ বাঁচাও আন্দোলন'-এ অটলজী ও কেদারনাথজীর সঙ্গে দীনদয়াল উপাধ্যায়, ৩০ জুন ১৯৬৫

এটাকেই পণ্ডিতজী একাত্মবাদ বলছেন। ভারত সবকিছুকেই একাত্ম করার ক্ষমতা রাখে। সব রকমের বিবিধতার মধ্যে একাত্ম ঐক্য খুঁজে বের করার দক্ষতা আমাদেরই আছে, সেই প্রথম বেদের যুগ থেকে আমরা বলেছি, 'একমসত বিপরা বহুধা' (একই কথা সবাই বিভিন্ন ভাবে বলে) আর এই একই কথা কবিগুরুও একাধিক বার বলছেন, 'মানবতার মহামিলন'।

পণ্ডিতজী বলছেন, পশ্চিমে যেমন কোনও এক সত্তাকে আরেকটি কোনও সত্তাকে খণ্ডন করেই নিজের আত্মপ্রকাশ করতে হয় আর তাই শেষমেশ ওরা 'class enemy' শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে। তাই পশ্চিমের 'revolution' আর আমাদের 'বিপ্লব' বা 'ক্রান্তি' এক নয়। আমাদের রাজনৈতিক চেতনা যার দুটো প্রমুখ গ্রন্থ হচ্ছে, গীতা/মহাভারত এবং কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র, —বলছে বিপ্লব সব সময়ই দিয়ে থাকে। ভারতের চিতির আত্মপ্রকাশ সেই সন্ধিক্ষণ যখন সমস্ত মানবসমাজের কল্যাণ হবে আর বিশ্বশান্তি পূর্ণতা পাবে। এই চিতির তত্ত্ব ও ধর্ম স্থাপন সহকারে ভারতের উদয় ঋষি অরবিন্দের ১৯৪৭-এর ৭ স্বপ্নের অবধারণার একাঙ্গ।

পণ্ডিতজী তাই আমাদের মনীষীদের চিন্তাধারার এক সামগ্রিক রাজনৈতিক মতাদর্শ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর আমরা এই সম্পূর্ণ ভারতীয় দর্শনের অনুসারে রাজনীতি করে থাকি যাতে ভারতের কল্যাণের মধ্য দিয়ে বিশ্ব কল্যাণের পথ প্রশস্ত হোক। আমাদের একাত্ম মানববাদ সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়। যা মার্ক্সবাদ বা নেহরুবাদের মতো বিদেশী, ভারতের পরিপন্থী নয়। এটা তো সহজ বুদ্ধি, যে যেমন তার কল্যাণ তার নিজের মতো চললেই হবে, অন্যের নকল করে কখনও কি কারোর মঙ্গল হয়েছে?

ছবিতে খবর

শক্তিশালী নারী শক্তিশালী ভারত

নদীয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার গোয়ালদহ রাধাগোবিন্দ মন্দিরে 'আমার মাটি আমার দেশ' অভিযানের 'অমৃত কলস'-এর পবিত্র কার্যক্রমে রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

বেলুড় মঠে আমার মাটি আমার দেশ অভিযানের অধীনে 'অমৃত কলস'-এর পবিত্র কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

সিউড়িতে বিজেপি বীরভূম জেলার পঞ্চায়েতিরাজ সম্মেলন

দুর্নীতিবাজ, চোর ও গুন্ডাদের থেকে পরিত্রান পেতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুশমন্ডি বিধানসভায় তৃণমূল ছেড়ে ১০০টি পরিবার বিজেপিতে যোগ দিলেন।

সিমলা স্ট্রিটে স্বামীজির বাসভবন থেকে 'আমার মাটি আমার দেশ' অভিযানের 'অমৃত কলস'-এর পবিত্র কার্যক্রমে বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী।

কোচবিহার নেতাজি সুভাষ ইন্ডোর স্টেডিয়ামে 'সাংসদ খেল মহোৎসব' ২০২২-২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী নিশীথ প্রামাণিক। মোদী সরকারের এই খেল মহোৎসবে বিভিন্ন বিভাগে রাজ্যের ৬০০০ প্রতিযোগী অংশ গ্রহণ করেন।

'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' নিয়ে রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গের অপচেষ্টার প্রতিবাদে রাজ্যপালকে স্মারকলিপি প্রদান করলেন রাজ্য বিজেপির বিধায়কগণ।

ছবিতে খবর

রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী পরিষদের সভায় রাজ্য বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার।

জেলায় জেলায় 'আমার মাটি আমার দেশ' অভিযানের 'অমৃত কলস'-এর পবিত্র কার্যক্রমে বিজেপি কার্যকর্তাদের সঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

বরানগরের ব্রহ্মময়ী কালিবাড়ি এবং নপাড়া শীতলা মন্দির সংলগ্ন দুধপুকুর থেকে আমার মাটি আমার দেশের মৃত্তিকা সংগ্রহ করলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলায় 'লোকসভা প্রবাস যোজনা' কর্মসূচি উপলক্ষ্যে বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি।

আসানসোল সাংগঠনিক জেলার বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউটে (ডুরান্ড ইনস্টিটিউট) প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজীর ১০৫তম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

বালুরঘাট ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ময়দানে 'মোদী কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট-এর ফাইনাল ম্যাচে রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার।

আসানসোল সাংগঠনিক জেলার রানীগঞ্জ ট্যাক্সি স্ট্যান্ড মাঠে জনসভায় রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার, বিধায়ক লক্ষণ ঘড়ুই ও অগ্নিমিত্রা পাল সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

ঋষি অরবিন্দর বসত বাড়ি থেকে 'আমার মাটি আমার দেশ' অভিযানের 'অমৃত কলস'-এর পবিত্র কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান

সল্টলেক সেক্টর-V এ বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে ওবিসি মোর্চার বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রের রানিরহাটের জনসভায় দুর্নীতিবাজ, চোর ও গুন্ডাদের থেকে পরিত্রান পেতে শতাধিক মানুষ বিভিন্ন দল ছেড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক এবং বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা'র নেতৃত্বে বিজেপিতে যোগ দিলেন।

সেবা পক্ষকাল অভিযান কর্মসূচি উপলক্ষে জেলায় জেলায় বিভিন্ন কার্যক্রমে বিজেপির নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দরা।

দুর্নীতিবাজ, চোর ও গুন্ডাদের থেকে পরিত্রান পেতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বুনিয়াদপুরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের ২০টি পরিবার বিভিন্ন দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন।

জেলায় জেলায় 'আমার মাটি আমার দেশ' অভিযানের অধীনে 'অমৃত কলস'-এর পবিত্র কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কার্যকর্তারা।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি: সময়ের দাবি

কৌশিক কর্মকার

শরিয়তপন্থী কাঠমোল্লাদের খুশি করতে রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার আইন প্রণয়ন করে সারাদেশে অসংখ্য অজস্র মুসলিম নারীদের ন্যায্য অধিকারকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। শরিয়া আইনে মুসলিম নারী একপ্রকার সীমাহীন বঞ্চনা ও শোষণের শিকার। এখনও কি সময় আসেনি একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ, ধর্ম নিরপেক্ষ দেওয়ানি আইন প্রণয়নের?

মাননীয় পাঠকের উদ্দেশে একটি ছোট প্রশ্ন— আপনারা কি শাহ বানোকে চেনেন? শাহ বানোর নাম কি আপনারা শুনেছেন? যদি উত্তর 'হ্যাঁ' হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি জানেন শাহ বানোর সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল? আর উত্তর নেতিবাচক হলে আপনাকে ঘটনাটি জানতে হবে, কারণ ভারতীয় রাজনীতির সামগ্রিক গতিপ্রকৃতি বুঝতে গেলে উক্ত নামটি ও তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাবৃত্ত সম্পর্কে আপনার অবহিত হওয়া অবশ্য প্রয়োজন।

শাহ বানো বেগম

১৯৩২ সালে ১৭ বছর বয়সী মুসলিম নারী শাহ বানোর বিবাহ হয় ইন্দোরের অর্থবান ও প্রভাবশালী আইনজীবী মহম্মদ আহমদ খানের সঙ্গে। তাদের তিন পুত্র ও দুই কন্যা হয়। ইতোমধ্যে আহমদ খান দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। ১৯৭৫ সালে ৬০ বছর বয়সী বৃদ্ধা শাহ বানো বেগমকে স্বামী আহমদ খান বাড়ি থেকে বের করে দেন। তিন বছর কোনও মতে কাটিয়ে অসহায় অর্থহীন শাহ বানো ১৯৭৮ সালে স্থানীয় আদালতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী মাসিক ৫০০ টাকা দাবি করে খোরপোশের মামলা করেন।

এর পরেই শাহ বানোকে তাঁর স্বামী তালাক দিয়ে দেন ও খোরপোশ দিতে অস্বীকার করেন। স্থানীয় আদালত তার স্বামীকে মাসিক পঁচিশ টাকা খোরপোশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। খোরপোশের আর্থিক পরিমাণ বাড়ানোর জন্য শাহ বানো মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। হাইকোর্ট খোরপোশের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেন ১৭৯.২১ টাকা। এই রায়ের বিরুদ্ধে আহমদ খান সুপ্রিম কোর্টে গেলে সুপ্রিম কোর্ট তার আবেদন খারিজ করে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে; এত দূর পর্যন্ত ঘটনাক্রম অত্যন্ত স্বাভাবিক। একজন বয়স্ক মহিলার শেষ বয়সে ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা রক্ষার তাগিদেই আদালতের এহেন পদক্ষেপ, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশিত হলে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড সহ মুসলিম সমাজের একটি বড় অংশ এই রায়ের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত প্রতিবাদ জানায়। প্রতিবাদ বিক্ষোভে পরিণত হয়; বিক্ষোভ রাজপথে নেমে আসে; কারণ সুপ্রিম কোর্টের রায় তাদের ধর্ম ও ধর্মীয় আইনকে আঘাত করেছে। বিবাহ বিচ্ছিন্না বৃদ্ধা শাহ বানোকে খোরপোশ প্রদান তাদের ধর্মীয় আইন বিরোধী। কেন্দ্রীয় সরকারে তখন রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন একক সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস সরকার। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অকার্যকর করার জন্য সংসদে প্রণীত হয় 'Muslim Women (Protection and Rights on Divorce) Bill, 1986'। এই আইন বলে মুসলিম স্বামীরা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে আর খোরপোশ দিতে বাধ্য থাকবেন না। এই আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই সারাদেশে অসংখ্য অজস্র মুসলিম নারীদের ন্যায্য অধিকারকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। যে নারীর সঙ্গে ৪৩ বছর সংসার করেছেন, পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাকে এক কথায় ঘর থেকে বের করে দেওয়া হল। রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার তার বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিল।

সম্মানীয় পাঠক, কীভাবে দেখবেন সরকারের এহেন ভূমিকাকে? 'তোষণ' না 'বিচার ব্যবস্থার ধ্বংসসাধন'? রাজীব গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধী আজকে ২০২৩ সালে নাকি 'ভালোবাসার দোকান' খুলেছেন! এই 'ভালোবাসা'র একমাত্র লক্ষ্যবস্তু যে ইসলামিক মৌলবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়, তা উপরোক্ত কাহিনিবৃত্তের সাহায্যে খুব সহজেই বুঝতে পারা যায়। নবগঠিত আই.এন.ডি.আই.এ. জোটের সকল আশা ভালবাসা এই ইসলামিক মৌলবাদ কেন্দ্রিক। মাঝে সাড়ে তিন দশকের ব্যবধান ঘটেছে, কিন্তু উভয় পক্ষের 'ভালবাসা'র বন্ধন অটুট আছে।

অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কী? আজকে এই প্রসঙ্গ উঠে আসছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয় বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোশ, উত্তরাধিকার, দত্তক গ্রহণ, অভিভাবকত্ব, উইল তৈরি, আমাদের জাগতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত এই বিষয়গুলি দেওয়ানি বিধি ব্যবস্থার

অধীন। বর্তমানে এই আইনের কোনও অভিন্নতা নেই অর্থাৎ দেশের সকল নাগরিকের জন্য এক্ষেত্রে সমান আইন প্রযোজ্য নয়। কিন্তু আইনের অপর ক্ষেত্র ফৌজদারি আইন, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে দেশের সকলের জন্য সমানভাবে একই আইন প্রযোজ্য।

সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির অন্তর্ভুক্ত ৪৪ নম্বর অনুচ্ছেদে রয়েছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির সংস্থান; সেখানে বলাই হয়েছে ভারতের ভৌগোলিক বৃত্তে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের জন্য রাষ্ট্র অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রচলনের প্রচেষ্টা করবে। সেই হিসেবে এটি হল একটি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু সংবিধান সভার এই প্রতিশ্রুতি এখনও পর্যন্ত বিধি রূপে কার্যকর করা গেল না। পূর্বোক্ত কাহিনীবৃত্তটি যার কারণটিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত; তা একান্তভাবে ব্যক্তিগত পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। কিন্তু ধর্ম যখন আইনের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায় তখন তা হয়ে ওঠে এক প্রকার অনধিকার প্রবেশ। জাগতিক বিষয়কে নিয়মবদ্ধ রাখার জন্য, সমাজে সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার মধ্যেই আইন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিহিত এবং তাইই হল আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার লক্ষ্য। কিন্তু দুর্বল শাহ বানোকে ন্যায়বিচার দিতে রাষ্ট্র ব্যর্থ হল; কারণ আমাদের দেশে এখনও লাগু রয়েছে 'The Sharia Act– 1937'।

মুসলিম সমাজের বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, খোরপোশ, দত্তক গ্রহণ, অভিভাবকত্ব, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, উইল তৈরির মতো বিষয়গুলি শরিয়া আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়। শরিয়া আইন অনুযায়ী মুসলিম পুরুষের বহুবিবাহ আইনত বৈধ হলেও মুসলিম মহিলাদের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ; নাবালিকা বিবাহ স্বীকৃত, মেয়েদের রজস্রাবের সূচনা মাত্রই সে বিবাহের যোগ্য; বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে আদালতের কোনও ভূমিকা নেই, মুসলিম পুরুষ যে কোনও সময় তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে, স্ত্রীর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সংস্থান এখানে নেই।

সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পিতার মৃত্যুর পর কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের অর্ধেক সম্পত্তি পান; একজন মুসলিম মা কখনওই তার নাবালক পুত্র বা কন্যার অভিভাবক হতে পারেন না, তা তিনি আর্থিকভাবে যতই সঙ্গতিসম্পন্ন হন না কেন; মুসলিম স্ত্রীলোক কখনওই দত্তক নিতে পারেন না; স্বভাবতই যা অনুধাবন করা যাচ্ছে তা হল এই আইনে মুসলিম নারী একপ্রকার সীমাহীন বঞ্চনা ও শোষণের শিকার। এখনও কি সময় আসেনি একটি লিঙ্গ নিরপেক্ষ, ধর্ম নিরপেক্ষ দেওয়ানি আইন প্রণয়নের? সারা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য অজস্র অসহায় শাহ বানোকে সুবিচার প্রদান রাষ্ট্রের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে; এবং তার জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা রাষ্ট্রের আশু কর্তব্য।

এক্ষেত্রেও একটি সহজ ও জরুরি বিষয়কে গুলিয়ে দেওয়ার একটি দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা চলছে। সংবিধান প্রণয়নের সময় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি অকার্যকর করার ক্ষেত্রে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপিত হয়েছিল, এখনও সেই একই যুক্তি তুলে আনছে পার্সোনাল ল বোর্ড— মুসলিম পারিবারিক আইন অপরিবর্তনীয়, আইনসভা বা বিচার বিভাগ তাকে বদলাতে পারে না। সম্প্রতি তাৎক্ষণিক তিন তালাকের মতো মধ্যযুগীয়

Home › Specials › Shah Bano Case: When Rajiv Gandhi overturned SC judgement protecting Muslim women's right to...

Political History of India | Politics | Specials

Shah Bano Case: When Rajiv Gandhi overturned SC judgement protecting Muslim women's right to maintenance during talaq

The Muslim hardliners, clerics pushed the then Rajiv Gandhi government, elected in 1984, to pass the Muslim Women (Protection on Divorce ... overturned the Supreme Court's verdict in the Shah Bano case.

20 August, 2020 OpIndia Staff

শাহ বানোকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল রাজীব গান্ধী সরকার

প্রথা বাতিল হয়েছে কিন্তু অপরাপর তালাক প্রথাগুলি সমানভাবে চালু আছে; যা প্রমাণ করে শরিয়া আইন অপরিবর্তনীয় নয়।

আর বিরোধীরা ১৯৮৬ সালের মতো ২০২৩ সালেও তাদের অবস্থান স্পষ্ট করেছে; অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রচলন ঘটলে নাকি ভারতের বহুত্ববাদী চরিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে; বিরোধীদের খুব পছন্দের একটি টার্ম 'সোশ্যাল ফেব্রিক', অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নাকি তথাকথিত 'সোশ্যাল ফেব্রিক'কে বিনষ্ট করবে! এই বক্তব্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হল ঘুরিয়ে শরিয়া আইনকে সমর্থন করা ও হাজার হাজার শাহ বানোকে

কেন্দ্রীয় সরকারে তখন রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার। সুপ্রিম কোর্টের রায়কে অকার্যকর করার জন্য সংসদে প্রণীত হয় 'Muslim Women Bill, 1986'। এই আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গেই রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন সরকার শাহ বানোদের বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকুও কেড়ে নিয়েছিল।

এক গভীর বিপন্নতার অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত করা; তাদের সমান অধিকারের দাবিকে পদপিষ্ট করা। মুসলিম নারীদের সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা, খোরপোশ থেকে বঞ্চিত করার মতো শোষণমূলক ব্যবস্থা কখনও বহুত্ববাদের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

বিরোধীদের আরও বক্তব্য, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নাকি হিন্দু আধিপত্যবাদের সূচক! সমস্ত যুক্তির অতীত এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বলা যায়, হিন্দু কোড বিলে হিন্দু নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত হয়েছে; তা কোনও হিন্দু ধর্মগ্রন্থের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি এবং তা কোনও ধর্মীয় আইন নয়। তাই বর্তমান সময়ের দাবি যে কোনও মূল্যে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির প্রচলন। আমাদের সকলের কর্তব্য এই দাবিতে ক্রমাগত সোচ্চার হওয়া, এই আইন প্রণয়নে যেন আর কোনও বিলম্ব না ঘটে।

ঋণ:

১। অভিন্ন দেওয়ানি বিধির রূপরেখা: ওসমান মল্লিক

কাশীক্ষেত্রে জ্ঞানবাপী

বিনয়ভূষণ দাশ

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির শেষবারের মতো আওরঙ্গজেব ধ্বংস করে তার উপর জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করেছিল। মসজিদের নাম দেওয়া হয় পার্শস্থ 'জ্ঞানবাপী' পুষ্করিণীর নামে। তবে বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরের ওপর আঘাত এসেছে বারংবার। আক্রমণকারীদের দীর্ঘ সেই তালিকায় রয়েছে কুতুবুদ্দিন আইবক, হুসেন শাহ্ শারকি, সিকান্দার লোদি এবং তথাকথিত সৌন্দর্যের উপাসক শাহজাহানের নাম। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ হোলকারের হাত ধরে যে বিশ্বনাথ মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ পৃথিবীর সমস্ত হিন্দু সমাজ আশা করে, আধুনিক পঞ্চকন্যার হাত ধরে বাবা বিশ্বনাথ আবার স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হবেন।

গত কিছুদিন থেকে সমগ্র ভারতে সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে কাশীর জ্ঞানবাপী মসজিদ বিতর্ক। অথচ, সঠিক অর্থে বলতে গেলে ঘটনার সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে বিতর্কের কোনও অবকাশই নেই। ঘটনার পেছনে রয়েছে বারাণসীর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালতে চারজন মহিলা আবেদনকারী এবং মূল আবেদনকারী রাখী সিং— এই পাঁচজন আবেদনকারী বারাণসীর সিভিল জজ আদালতে আবেদন জানান যে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ও জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরের জ্ঞানবাপী মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের পাশে অবস্থিত তাঁদের আরাধ্যা মা শৃঙ্গার গৌরীর পবিত্র স্থলে সারা বৎসর ধরে তাঁরা পূজা-প্রার্থনা করতে চান এবং সেজন্য তাঁদের অনুমতি দেওয়া হোক। আর এই আবেদনের প্রেক্ষিতেই বারাণসীর সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত এক আদেশ জারি করে বিশ্বনাথ মন্দির সংলগ্ন জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে 'ভিডিওগ্রাফি' করে 'পর্যবেক্ষণ' করার অনুমতি দেয়।

আদালতের এই রায়ের প্রেক্ষিতে মসজিদ পরিচালন সমিতি আপত্তি জানায়। আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদের যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ মহম্মদ ইয়াসিন আদালতের পূর্বোক্ত রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে। যদিও সাম্প্রতিক এক রায়ে আদালত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে এবং তার ভিডিওগ্রাফি করার নির্দেশ দেয়। পূজাপাঠের অনুমতিও তাঁরা দেয়। কিন্তু মসজিদ সমিতি আদালতের উপরোক্ত নির্দেশকে 'পক্ষপাতদুষ্ট' বলে অভিহিত করে। এই মামলাটি ২০২১-এর আগস্ট থেকে চলে আসছে। জ্ঞানবাপী মসজিদ-কাশী বিশ্বনাথ মন্দির বিষয়টি যেহেতু এখন আদালতের বিচার্য তাই সে বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থেকে আমরা বরং কাশী বিশ্বনাথ মন্দির-জ্ঞানবাপী মসজিদের ঐতিহাসিক দিকটি নিয়ে আলোচনা করি।

এ কথা ইতিহাসের সাধারণ ছাত্র এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত মানুষজন জানেন যে, কাশী বিশ্বনাথের এই মন্দিরটি মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ধ্বংস করে তার ভিতের উপর জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করেন। এ তথ্য সমস্ত ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদরা স্বীকার করেছেন তাঁদের লেখায়। কিছু সন্দর্ভ এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে

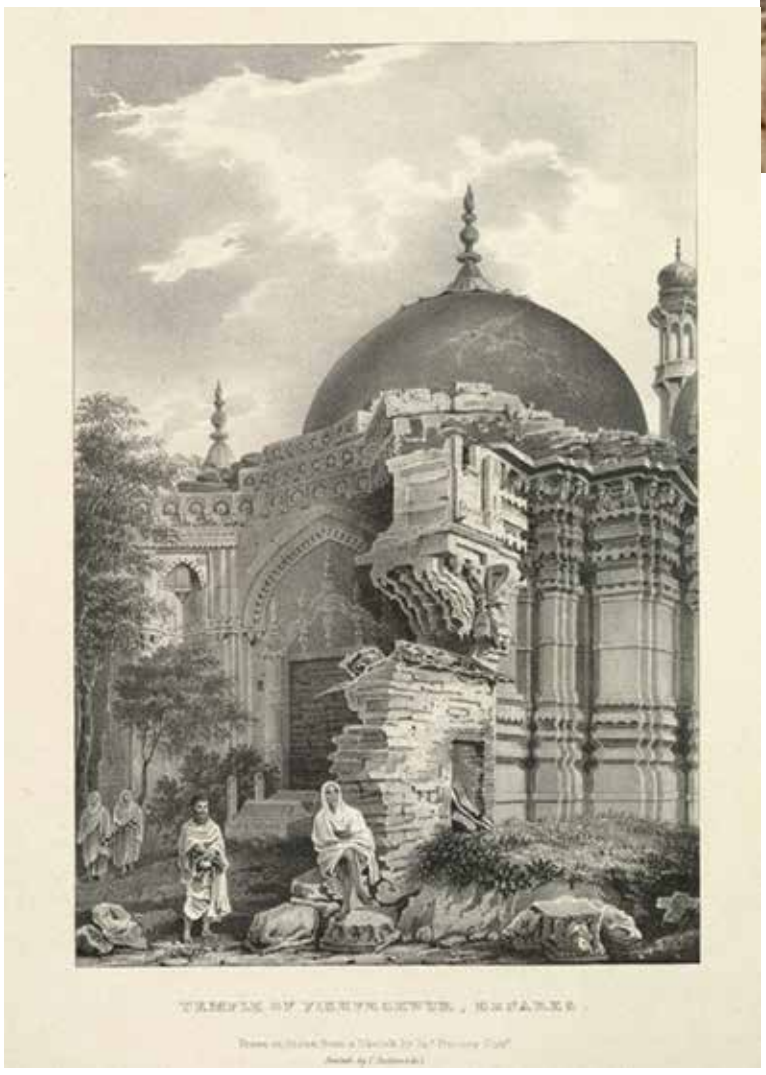

১৮৩৪ সালে জেমস প্রিন্সেপের হাতে আঁকা ছবিতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির

বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংস করে নির্মিত জ্ঞানবাপী মসজিদ, এইসময়ের তোলা ছবি। জেমস প্রিন্সেপের হাতে আঁকা ছবির সঙ্গে কী অদ্ভুত মিল!

হয়। সেই ঐতিহাসিকদের মধ্যে যেমন আওরঙ্গজেবের সভাসদ আছেন, তেমনই বিভিন্ন ইংরেজ ঐতিহাসিকও আছেন। কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকও আছেন। একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মধ্যযুগের ইতিহাসের মূল উপাদান আমরা পাই আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে আসা বিভিন্ন আফগান, তুর্কি, মঙ্গোল ইত্যাদি হানাদারদের সঙ্গে আসা বিভিন্ন বিবরণ লিখিয়েদের (Chroniclers) বিবরণ থেকে। ওইসব বিবরণ লিখিয়েরা বেশ সোৎসাহে এবং সোল্লাসে তাঁদের পৃষ্ঠপোষক দখলদারদের অপকর্মের বিবরণ দিয়েছেন।

যাইহোক আওরঙ্গজেবের এই মন্দির ভাঙা এবং সেই স্থলে মসজিদ গড়ে তোলার সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ লিখে গিয়েছেন তাঁরই সভাসদ মহম্মদ কাজিম এবং সাকি মুস্তাইদ খাঁ। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দশ বৎসরের প্রাত্যহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে মহম্মদ কাজিমের 'আলমগীরনামা'য়। এটি আওরঙ্গজেবের নির্দেশে লেখা হয়েছিল। কিন্তু ১৭০৭ সালে আওরঙ্গজেব মারা যায়। আর মহম্মদ কাজিমও এর মধ্যে মারা যাওয়াতে এই লেখা বন্ধ থাকে। পরবর্তী বৎসরগুলির প্রাত্যহিক বিবরণ রাজদরবারের বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ (আখবরাত) থেকে সংকলন করে লিপিবদ্ধ করেন সাকি মুস্তাইদ খাঁ। আওরঙ্গজেবের অনুগত এনায়েতউল্লা খাঁর অনুরোধে তিনি এই পুস্তক রচনা করেন। এজন্য তাঁকে মুঘল দরবারের সেরেস্তার নথিপত্র (আখবরাত) দেখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তিনি সেখান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহ করে আলমগীরনামা বইটি সম্পূর্ণ করেন এবং সমগ্র বইটির নাম দেন 'মাসির-ই-আলমগিরি'। ঐতিহাসিকদের মতে, এই বইটিই আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল সম্পর্কে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তক।

নির্ভরযোগ্য এই পুস্তকে বলা হয়েছে, 'সম্রাটের রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে, বৃহস্পতিবার ৯ এপ্রিল ১৬৬৯ গ্রহণের দিন ছিল। ওইদিন গোঁড়া ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী সম্রাট জানতে পারেন, তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত থাত্তা, মুলতান, এবং বিশেষ করে বারাণসীতে বিধর্মী, অবিশ্বাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁদের পাঠশালায় ভুল শিক্ষা দেয় এবং বহুদূর থেকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ভুল শিক্ষা নিতে এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের কাছে আসে। ইসলাম ধর্ম প্রসারে আগ্রহী ক্রুদ্ধ সম্রাট সাম্রাজ্যের অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের শাসকদের কাছে এক সাধারণ নির্দেশ পাঠিয়ে এই সমস্ত ভুল শিক্ষা দেবার পাঠশালা এবং মন্দিরগুলো অবিলম্বে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেন।' ঐতিহাসিক S.M. Edwards and H.L.O. Garrett তাঁদের Mughal Rule in India গ্রন্থে লিখেছেন, 'The Muslim governors executed the order with a hearty will. In August 1669, the great temple of Vishwanath at Benaras was pulled down'. আর 'মাসির-ই-আলমগিরী'তে সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখলেন, '2 September– News came to Court that according to the Emperor's command, his officers had demolished the temple of Vishwanath at Benaras.' এমনকি বারাণসী শহরের নামও পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল 'মুহম্মদাবাদ'। একই বিবরণ দিয়েছেন আব্দুল হামিদ লাহোরি তাঁর 'পাদশাহনামা' গ্রন্থে।

সমসাময়িক পর্যটক নিক্কোলো মানুক্কি তাঁর লেখা Storia Do Mogor নামক ভ্রমণ কাহিনিতে বারাণসী সম্পর্ক লিখেছেন, This city

is small but very ancient, and venerated by the Hindus, by reason of a temple there possessing a very ancient idol. Some years after my visit, Aurangzeb sent orders for its destruction, when he undertook the knocking down of all temples. সমকালীন অন্যান্য পুস্তকেও আওরঙ্গজেবের এই মন্দির ধ্বংসলীলার বর্ণনা পাওয়া যায়। সমকালীন লেখক ঈশ্বরদাস নাগর তাঁর 'ফুতুহাৎ-ই-আলমগিরী'তেও সমস্ত সাম্রাজ্যজুড়ে এই মন্দিরভাঙ্গার ফতোয়া জারির উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরদাস নাগর তাঁর গ্রন্থে আরও লিখেছেন, আওরঙ্গজেবকে মথুরার মন্দির ভাঙ্গার খবর জানালে সে আবারও হুকুম জারি করে, সমস্ত মন্দির ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। আবার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হুগলী বন্দরের ইংরাজ কর্মচারী ডি গ্রাফ ১৬৭০ খ্রিস্টাব্দে এক বিবৃতিতে লিখেছেন, 'In the month of January, all the Moorish Governors and Officers received orders from the Grand Mughal to prevent the observance of the heathen religion in the whole country and to wall in all the temples and pagodas of the idolators. এখানে শুধু বারাণসী বা মথুরার মন্দির নয়, সমগ্র দেশের মন্দির ভাঙ্গার কথা বলা হয়েছে।

আওরঙ্গজেবের মন্দির ভাঙ্গার এই ধরনের ফরমান জারির উদাহরণ সমসাময়িক বিভিন্ন পুস্তকে পাওয়া যায়। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই লেখা 'মুরাকত-ই-হাসান' (১৬৭০) পুস্তকে বলা হয়েছে, Reports of the destruction of temples should be sent to the Court under the seal of the Qazis and attested by pious Shaikhs. স্যার যদুনাথ সরকার আমাদের জানিয়েছেন, ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁর কর্মচারীদের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠিয়ে দেন বাংলার সমস্ত পরগণায় যত মন্দির আছে সেসমস্ত মন্দির ধ্বংস করার জন্য। এই ধরনের একটি নির্দেশনামা ঢাকা জেলার ধামরাইতে অবস্থিত যশোমাধব মন্দিরে রক্ষিত আছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আওরঙ্গজেবের সময়কালে লেখা বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ, তাঁর নির্দেশে লেখা পুস্তক ইত্যাদি থেকেই পরিষ্কার যে, তাঁরই নির্দেশে অন্যান্য মন্দির ভাঙ্গার সাথে সাথেই কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরও ভাঙা হয়েছিল এবং তারই কিছু অংশের ভিত্তিভূমির উপর জ্ঞানবাপী মসজিদ গড়ে তোলা হয়েছিল। যদিও ভিত্তিভূমি অবিকল রাখা হয়েছিল এবং মন্দিরের একটি প্রাচীর অবিকৃত রাখা হয়েছিল। হয়ত এটা করা হয়েছিল হিন্দুদের মনে আঘাত দেওয়ার জন্য এবং এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে, মুসলিম শাসনে কোনও মন্দির গড়া হলে সে মন্দিরের অবস্থা এমনই হবে। তবে উত্তর ভারতের হিন্দুরা তাঁদের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় এই মন্দির ধ্বংস করাকে চুপচাপ মেনে নেয়নি। তাঁরা এই মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য লড়াই করেছে, জীবন দিয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর প্ররোচনায় এবং মার্ক্সবাদী ও আলিগড়পন্থী ঐতিহাসিকদের দ্বারা যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সেখানে আওরঙ্গজেবের এবং অন্যান্য মুসলিম শাসকদের হিন্দুমন্দির ভাঙা এবং তার জায়গায় মসজিদ নির্মাণকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসেরও সেই অপব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, বারাণসীর ব্রাহ্মণেরা নাকি মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষায় হস্তক্ষেপ করত। সেইজন্য বিশ্বনাথ মন্দির ভেঙ্গে হিন্দু জমিদার ও হিন্দুসমাজের অন্যান্য নেতৃবর্গকে সাবধান করার চেষ্টা হয়েছিল। এই যুক্তি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত সেটা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি ৯ এপ্রিল ১৬৬৯-এ জারি করা সেই ভয়ানক নির্দেশে এবং পরবর্তী কালে অন্যান্য নির্দেশে শুধু বারাণসীর মন্দির নয়, আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ গড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

বারাণসীর বিশ্বনাথের মূল মন্দির প্রথম ধ্বংস করেছিল কুতুবুদ্দিন আইবক ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে গড়ে তোলা হয় রাজিয়া মসজিদ। গুজরাতের হিন্দু বণিকেরা আবার সেই মন্দির পুনর্নির্মাণ করে ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে। কিন্তু পরে আবার মন্দির ধ্বংস করে দেয় হুসেন শাহ্ শারকি ও সিকান্দার লোদি। আকবরের রাজত্বকালে রাজা মান সিং মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। তথাকথিত সৌন্দর্যের উপাসক মুঘল সম্রাট শাহজাহান ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে এই বিশ্বনাথ মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন। আর শেষবারের জন্য বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করা হয় হিন্দু ধর্মদ্বেষী মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১৬৬৯ সালের ফরমান বলে এবং তার স্থলে গড়ে তোলা হয় 'জ্ঞানবাপী' মসজিদ। মসজিদের নাম দেওয়া হয় পার্শ্বস্থ 'জ্ঞানবাপী' পুষ্করিণীর নামে। মন্দিরের মূল বিগ্রহ 'শিবলিঙ্গ' বা 'লিঙ্গম' পুরোহিতেরা লুকিয়ে রাখেন পার্শ্বস্থ 'জ্ঞানবাপী' কূপে। এটাই হয়ত একমাত্র মসজিদ পৃথিবীতে যার নাম দেওয়া হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। পুরনো মন্দিরের বিশাল চত্বর অবিকৃত রেখে দেওয়া হয়, রেখে দেওয়া হয় নানা হিন্দু 'মোটিফ' সহ পশ্চিমের দেওয়ালটি। বিভিন্ন অঞ্চলের হিন্দু শাসকেরা, বিশেষ করে মারাঠা শাসকেরা আওরঙ্গজেবের হাতে এই মন্দির ধ্বংসের বিরুদ্ধে খুবই সোচ্চার ছিল। এমনকি নানা ফড়নবিশ জ্ঞানবাপী মসজিদ ভেঙ্গে সেইস্থলে আবার বিশ্বনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব দেন। লখনৌর নবাবগণ এই প্রচেষ্টায় বাধা দেয়। ইন্দোরের শাসক মলহররাও হোলকার ১৭৪২ সালে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে মলহর রাওয়ের পুত্রবধু অহল্যাবাঈ হোলকার ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বিশ্বনাথের মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন।

কাশীর বিশ্বনাথ মন্দিরটি যে শেষবারের মতো আওরঙ্গজেব ধ্বংস করে তার উপর জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন সেকথা উপরোক্ত নানা ইতিহাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণিত। আদালতের নির্দেশে 'ভিডিওগ্রাফি' করেও সেই প্রমাণই পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও মসজিদ পক্ষ এবং মুসলিমরা এই অবৈধ দখল ছাড়তে রাজি নয়। এত ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আবার প্রমাণ চাওয়া হচ্ছে! এক্ষেত্রে তাঁরা হিন্দুদের ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষা নিতে চাইছে বলে মনে হয়!

যাইহোক, সাম্প্রতিক খবর হল, এলাহাবাদ হাইকোর্ট জ্ঞানব্যাপী মসজিদ চত্বরে ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ বিভাগকে বৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ চালানোর অনুমতি দিয়েছে; আদালত আঞ্জুমান ইন্তেজামিয়া মসজিদ কমিটির আবেদন অগ্রাহ্য করেছে। জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে সেই অনুযায়ী সার্ভে চলছে। পূজার্চনার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। ইন্দোরের রাণী অহল্যাবাঈ হোলকারের হাত ধরে বিশ্বনাথ মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর সমস্ত হিন্দু সমাজ আশা করে, আধুনিক পঞ্চকন্যার হাত ধরে বাবা বিশ্বনাথ আবার স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত হবেন।

নূহের সহিংসতা

নেহাতই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নাকি রবীন্দ্রনাথ কথিত ‘দুক্কুর বেলার ভূত’?

সৌভিক দত্ত

হরিয়ানার নূহ জেলায় দাঙ্গাবাজ ইসলামপন্থীদের আক্রমণ হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর। মেওয়াতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে জলাভিষেক শোভাযাত্রায় পাথর ছোঁড়া হয়। দাঙ্গাকারীরা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগানও তোলে। নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় বজরং দলের এক কর্মীকে। দোষ কার? উত্তরের অপেক্ষায় ভারত।

বর্তমান পৃথিবীতে ভারতই সম্ভবত একমাত্র দেশ যেখানে সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপরে আক্রমণ করে খুন-জখম করে-লুটপাট-ধর্ষণ করে বাস্তুহারা বানায়। শুনতে হাস্যকর হলেও এটাই সত্যি। দোষ আসলে কার? যারা সংখ্যায় কম হয়েও আক্রমণ করে তাদের? নাকি যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও নিজেদের উপর আক্রমণ হতে দেয় তাদের? সেই প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় স্বাধীনতা ও দেশ ভাগের পরও ভারতে কাশ্মীর - গোধরা - দেগঙ্গা - বসিরহাট - কোয়েম্বাটোর - কলকাতা সহ অসংখ্য অসংখ্য দাঙ্গা বা গণহত্যার উদাহরণ আছে যেখানে সংখ্যালঘুরাই শান্তিপ্রিয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের আক্রমণ করেছে। সেই তালিকায় এবার আরেকটি নাম যুক্ত হল— হরিয়ানার নূহ।

হরিয়ানাতে নূহ হল একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ জেলা। মহাভারতের যুগ থেকেই এর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। এখানে তিনটি শিব লিঙ্গ আছে যার সঙ্গে পাণ্ডবদের যোগসূত্র পাওয়া যায়। এছাড়া বাসুদেব কৃষ্ণও নাকি এখানে তার গরু চরাতেন বলে কথিত। এখানেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তিন বছর আগে জেলার পবিত্র হিন্দু স্থানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য ব্রজমণ্ডল যাত্রা শুরু করে। পবিত্র স্থানগুলিকে জমি মাফিয়াদের থেকে রক্ষা করাটাও ছিল এই যাত্রার অন্যতম লক্ষ্য!

মেওয়াত দর্শন যাত্রা হল এই ব্রজমণ্ডল যাত্রারই অংশ। নূহ জেলা সহ হরিয়ানার অন্যান্য জেলার ভক্তরাও এই যাত্রায় অংশগ্রহণ করে। যাত্রাটি নূহ শহরের কাছে অবস্থিত একটি প্রাচীন মন্দির নলহার মহাদেব মন্দিরে একটি আনুষ্ঠানিক ‘জল অভিষেক’ দিয়ে শুরু হয়।

তারপর ঝিরকেশ্বর মহাদেব এবং শ্রাঙ্গার গ্রামের রাধাকৃষ্ণ মন্দির এবং শৃঙ্গেশ্বর মহাদেব মন্দির পরিদর্শন করা হয়। অসংখ্য তীর্থযাত্রী এতে অংশ নেয়।

নূহ হল মেওয়াত অঞ্চলের অংশ। এখানে মেও সম্প্রদায় বসবাস করে যারা আগে হিন্দু ছিল। এদের পূর্বপুরুষরা ছিল চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং সুলতানী আমলে ফিরোজ শাহ তুঘলকের সময় এরা ধর্মান্তরিত হয়। ধর্মান্তকরণের পরেও এরা নিজেদের রাজপুত রক্ত নিয়ে গর্ব করত। মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের (রাণা সঙ্গ) সঙ্গে জোট করে দিল্লির সালতানাতের সঙ্গে এরা লড়াই করেছিল এবং ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিয়েছিল। এদের সুলতান ছিল রাজা হাসান খান মেওয়াতী যিনি খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের বিরুদ্ধে রাণা সঙ্গের পক্ষে লড়াই করে নিহত হন। কিন্তু পরিস্থিতি বদলে যায় ১৯২০ সালের পর থেকে। তখন থেকেই তাবলিগ-ই-জামাতের প্রভাবে এরা ধর্মান্ধ উগ্র সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠতে শুরু করে। যার শেষ পরিণতি হল সেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপরে প্রাণঘাতী হামলা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭-এ দেশভাগের সময়েই আলওয়ার

ভূয়োদর্শী রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই কালান্তর গ্রন্থে 'সমস্যা' প্রবন্ধে হিন্দুদের দুর্বলতা ও পরাজয় বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে 'ঠিক দুক্কুর বেলায় ভূত যদি ঢেলা মারে তাহলে আমরা যেন ঢেলাটাকে ফেলে দিয়েই নিজেদের কর্তব্য সমাধা না মনে করি। কারণ ঢেলা একটা ফেললেই আরেকটা উড়ে আসবে। সমস্যা ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধা হবে না যতক্ষণ না আসল ভূতটাকে ধরা হচ্ছে'।

এবং ভরতপুর রাজ্যের মহারাজারা এই উগ্র হয়ে ওঠা মেওদের উপরে আক্রমণ চালায়। ফলে ওরা প্রত্যেকে পাকিস্তানে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একটি সফল জনবিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু গান্ধীজী ওদের কাছে গিয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দিলে ওরা পাকিস্তান যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে আর ভারতেই থেকে যায়। ফলে ওই জেলাটি ভারতের অন্যতম মুসলিমপ্রধান জেলা হিসাবেই থেকে যায়। ২০১১ সালে ওই জেলায় মুসলিম জনসংখ্যা ছিলো ৭৯.২০ শতাংশ! স্থানটিকে অনেক সময় মিনি পাকিস্তান বলেও সম্বোধন করা হয়। চুরি - ছিনতাই - অপহরণ - যৌন নিপীড়ন - গোহত্যা - গরুপাচার সহ অসংখ্য অপরাধের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে এই অঞ্চল। আর এই গোহত্যা ও গরুপাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেই মুসলিম সমাজের চক্ষুশূল হয়ে ওঠে মনু মানেসর নামে এক হিন্দু যুবক। বলা হচ্ছে যে এই মনু মানেসরকে আক্রমণ করে পথের কাঁটা দূর করার জন্যই সেদিন আক্রমণ চালানো হয় তীর্থযাত্রীদের উপরে।

যদিও পুলিশের মতে সম্পূর্ণ হামলাটাই সুপরিকল্পিত ছিল। আক্রমণের প্রায় এক সপ্তাহ আগেই ২১-২৩ জুলাইয়ের মধ্যে হোয়াটস্যাপ গ্রুপ খুলে ফেলা হয় যাত্রায় আক্রমণ পরিকল্পনার জন্য। এই পরিকল্পনার মধ্যে ছিল দাঙ্গার জন্যে দায়িত্ব দেওয়া, পাথর ও বোতল ছোঁড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। দাঙ্গার আগে তারা ৩০০০-এর মতো বোতল ও পাথর সংগ্রহ করেছিল। হিন্দুস্তান টাইমসের রিপোর্ট অনুসারে, দাঙ্গাকারীরা ২০০টিরও বেশি বাইক তৈরি রেখেছিল এবং পুলিশের থেকে বাঁচতে রেজিস্ট্রেশন প্লেটের উপর রং লাগিয়ে দিয়েছিল। পুলিশি অভিযানে উদ্ধার হয়েছে 'বিশাল' পরিমাণ পাথর এবং অন্যান্য বিস্ফোরক।

ঘটনার দিন অর্থাৎ ৩১ জুলাই যাত্রা এগোনোর সময় নূহের খেদলা মোড়ে তাদের আটকানো হয় এবং পাথর ছুঁড়ে আক্রমণ শুরু করে। স্থানীয় হিন্দুদের গাড়ি, বাড়িঘর এবং দোকানগুলিতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আক্রমণ ক্রমশ তীব্রতর হতে শুরু করলে তীর্থযাত্রীরা নিকটবর্তী নুলহার মহাদেব মন্দিরে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানেও কোনও রেহাই মেলেনি। আক্রমণকারীরা মন্দিরেও আক্রমণ চালায় তীর্থযাত্রীদের দিকে গুলি ও পাথর ছোঁড়ে। পুলিশ এসে উদ্ধার করার আগে পর্যন্ত প্রায় ৫ ঘণ্টা ধরে সেই মন্দিরে আক্রমণ চালানো হয়। অপরদিকে দ্য ওয়্যারের রিপোর্ট অনুসারে নূহ মন্দিরের পুরোহিতেরা জানিয়েছেন, সেদিন মন্দিরে অন্তত ৩০০০ থেকে ৪০০০ লোক আশ্রয় নিয়েছিল।

দাঙ্গাবাজরা নূহ-এর সাইবার থানার গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই থানার উপরে তাদের দীর্ঘদিনের রাগ ছিল। ওই মিনি পাকিস্তানে গরু-জবাই, গো-পাচার সহ সমস্ত ধরনের অপরাধে বাধা সৃষ্টি করে আসছিল এই থানা। এছাড়াও নূহ বাসস্ট্যান্ড, নূহ বাজার এবং নূহ শস্য বাজারের মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও আক্রমণ চালানো হয়। স্থানীয় হিন্দু দোকানগুলি সব লুট হয়।

এই হামলায় হতাহতের কথা বললে সবার আগে উঠে আসে দুটো নাম— অভিষেক চৌহান এবং প্রদীপ শর্মা। বাড়ির একমাত্র উপার্জনশীল অভিষেক ছিলেন বজরং দলের সদস্য। এলাকায় পরোপকারী হিন্দুত্ববাদী বলে সুনাম ছিল তার। হামলার দিন ২২ বছর বয়সী অভিষেক একটি বাসে পানিপাল থেকে ধর্মীয় শোভাযাত্রা জলাভিষেক ব্রজ মণ্ডল যাত্রা মেওয়াত দর্শনে অংশ নিতে নূহতে আসেন। বিকালের দিকে আক্রমণ শুরু হলে অভিষেকের গায়ে গুলি লাগে। আহত অভিষেককে তার খুড়তুতো ভাই মহেশ সরিয়ে নিতে গেলে হামলাকারীরা তলোয়ার নিয়ে তাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কোপের পর কোপ বসার ফলে একসময় অভিষেক নির্জীব হয়ে যায়। কিন্তু তাও এই বজরং দল কর্মীর মৃতপ্রায় শরীরও আক্রমণকারীদের কাছে যথেষ্ট আতঙ্কের কারণ ছিল। সেইজন্যে সেই অবস্থাতেই নৃশংসভাবে অভিষেকের মাথায় পাথর মেরে মাথা থেঁতলে দিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়।

অভিষেকের খুড়তুতো ভাই মহেশের অভিযোগের ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮, ১৪৯, ৩০৭, ৩২৪, ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়, আদিল, আরসাদ, আজহারউদ্দিন, শাকিল, জুনায়েদ, জাভেদ, রাহুলের বিরুদ্ধে। এছাড়া অভিযোগ দায়ের করা হয় আহমেদ, শোয়েব, ল্যাংদা, আলতাফ, আমীন ও ইনামের নামেও। মন্দিরে হামলার বিবরণ দিয়ে কর্তব্যরত

ম্যাজিস্ট্রেট মুকুল কাঠুরিয়ার করা অভিযোগের সঙ্গে দায়ের করা অভিযোগের বেশিরভাগ নামই মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। হামলায় নিহত অপরজন প্রদীপ শর্মাকেও গুলি করা হয়। পরে দিল্লি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এছাড়াও শক্তি সিং নামেও একজন এই তাণ্ডবের ফলে নিহত হয়।

তবে এই আক্রমণ শুধুই একমুখী হয়নি। প্রাথমিকভাবে হিন্দুরা এই হঠাৎ আক্রমণে হতচকিত হয়ে গেলেও খুব তাড়াতাড়িই তারাও প্রতিরোধ শুরু করে। নূহ ছাড়িয়ে উত্তেজনা গুরুগ্রাম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পাল্টা আক্রমণে গুরুগ্রামের আঞ্জুমান জামে মসজিদের ডেপুটি ইমাম মোহাম্মদ সাদ সহ কয়েকজন আহত নিহত হয়। হরিয়ানা সরকারের দুজন হোমগার্ডও সংঘর্ষের মাঝে পড়ে দুঃখজনকভাবে নিহত হয়েছে। তবে হরিয়ানার রাজ্য সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ায় যতটা আশঙ্কা করা হয়েছিল হিংসা ততটা ছড়ায়নি। হরিয়ানা সরকার নূহ জেলায় ২রা আগস্ট পর্যন্ত সমস্ত মোবাইল ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা নিষিদ্ধ করে। নূহ জেলায় কারফিউ জারি করা হয়। পেট্রোল ডিজেল বিক্রিও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পালওয়াল, মানেসার এবং পতৌদিতেও ইন্টারনেট সীমাবদ্ধ ছিল। পশ্চিম উত্তর প্রদেশের ১১টি জেলা বিশেষ করে নূহর সীমান্তবর্তী মথুরার জন্য সতর্কতা জারি করা হয়। দাঙ্গায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১১৬ জনেরও বেশি লোককে গ্রেফতার করেছে হরিয়ানা পুলিশ।

হরিয়ানা সরকার সিআরপিএফ-এর নতুন একটি দাঙ্গা-বিরোধী ইউনিট আরএএফকে নূহ-তে শিবির স্থাপন করার জন্য জমির অনুমোদন দিয়েছে। আইআরবি ২য় ব্যাটালিয়নের সদর দপ্তরও নূহতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও ভবিষ্যতের নিরাপত্তা হিসাবে হরিয়ানা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি নূহের কাছে তাওরু শহরে বসবাসকারী বাংলাদেশীদের অবৈধ ঝুপড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে। ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটসও এই এলাকায় বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপে শিশুদের জড়িত থাকার বিষয়ে একটি তদন্ত শুরু করেছে। ভবিষ্যতে নূহ যাতে আবার অশান্ত না হয় তারজন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে হরিয়ানা সরকার! তবে সেটাই বোধহয় যথেষ্ট নয়।

ভূয়োদর্শী রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই 'কালান্তর' গ্রন্থে 'সমস্যা' প্রবন্ধে হিন্দুদের দুর্বলতা ও পরাজয় বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে 'ঠিক দুক্কুর বেলায় ভুত যদি ঢেলা মারে তাহলে আমরা যেন ঢেলাটাকে ফেলে দিয়েই নিজেদের কর্তব্য সমাধা না মনে করি। কারণ ঢেলা একটা ফেললেই আরেকটা উড়ে আসবে। সমস্যা ততক্ষণ পর্যন্ত সমাধা হবে না যতক্ষণ না আসল ভুতটাকে ধরা হচ্ছে'। ঠিক তেমনই একটা নূহকে শান্ত করলে অন্য একটা বসিরহাট কিংবা দেগঙ্গা অশান্ত হয়ে উঠবে, যতক্ষণ না সমস্যার শিকড় পর্যন্ত আমরা পৌঁছতে পারছি! আর যেদিন সেটা পারব যেদিন সমস্যাটাকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে সীমান্তের ওপারে ছুঁড়ে ফেলতে পারব সেদিন আর কোনও নূহ হবে না আর কোনও নূহকে শান্ত করারও পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। সেই শক্তিশালী সোনালি দিনেরই অপেক্ষায় রয়েছি আমরা।

ফেক নিউজ

ফেক নিউজ

কথায় বলে অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়ে বেশি ভয়ংকর। চন্দ্রযান-৩ নিয়ে কটাক্ষ করতে গিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র ও সাংবাদিক কুণাল ঘোষের বক্তব্যও তেমনটাই। অবশ্য এটা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যও। কুণাল ঘোষদের দাবি, '২০০৮ সালে ভারতের প্রথম সফল চাঁদ অভিযানটি হয়েছিল। নেমেছিল দক্ষিণ মেরুতেই'। না, অবশ্যই নামেনি। মানে অবতরণ করেনি। সাংবাদিকতার ভাষায় এটা হলুদ সাংবাদিকতা এবং তথ্যের দিক থেকে একেবারেই ভুল তথ্য। বিজ্ঞানের ভাষায়, ভারতের প্রথম চন্দ্রাভিযানে চন্দ্রযান-১ ল্যান্ড করেনি, করার কথাও ছিল না। অফিসিয়ালি চন্দ্রযান-১ ছিল ইমপ্যাক্ট প্রোব। মানে চাঁদের মাটিতে আছড়ে পড়ার কথা। যেহেতু সেটা কংগ্রেসের সময়ে হয়েছিল তাই কুণাল ঘোষ আর তাঁর বস উঠে পড়ে লেগেছেন সেমি ফেক নিউজ ছড়িয়ে চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের কৃতিত্ব কমিয়ে দিতে।

আসল খবর:

চন্দ্রযান-১ অভিযান ছিল একটি প্রযুক্তিগত অভিযান। চন্দ্রপৃষ্ঠের ১০০ কিলোমিটার উচ্চতায় ঘুরে ঘুরে ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠানোর কথা ছিল এই মহাকাশযানের। ভারতের তরফে চন্দ্রযানের ভিতরে একটি ৩২ কিলোগ্রামের তদন্তযান পাঠানো হয়েছিল। জুতোর বাক্সের আকারের অত্যাধুনিক ওই তদন্তযানের লক্ষ্যই ছিল চাঁদের বুকে আছড়ে পড়া।

ধরুন আপনি হেলিকপ্টার থেকে প্যারাসুট চেপে নীচে নামবেন। নীচে সমুদ্র আর তাতে দু-চারটে নৌকো। আপনাকে ব্যালেন্স করে ওদের মধ্যেই একটাতে ল্যান্ড করতে হবে। এজন্য প্রথমে আপনি হেলিকপ্টার থেকে পাথর ছুঁড়ে দেখে নিলেন সেটা কীভাবে যাচ্ছে বা হাওয়ার গতি কী রকম ইত্যাদি। এরপর আপনি প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কোনও একটা নৌকোতে ল্যান্ড করতে। ঢিল ছুঁড়ে উচ্চতা আর দিক মাপাটা চন্দ্রযান-১ হলে, আপনার ল্যান্ডিং চন্দ্রযান-৩।

ফেক নিউজ

ইন্ডিয়া জোটে তৃণমূল ও কংগ্রেসের জোটসঙ্গী সিপিএমের আধা সত্যি। সিপিএম নেতা ডাক্তার সূর্যকান্ত মিশ্রর আধা সত্যি। চন্দ্রযান-৩-এর সাফল্যকে খাটো করতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, দ্বারকা এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে অবাস্তব খরচা হয়েছে। তথ্যের জায়গা থেকে সিপিএম নেতা ভুল তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।

আসল খবর:

বাস্তব তথ্য হল যেখানে এই মানদণ্ডের রাস্তার জন্য ২০০-২১৫ কোটি খরচ হবার কথা, সেখানে কেন্দ্র আরও ১২% কম খরচে ১৮২ কোটি টাকায় কমপ্লিট করছে এই প্রজেক্ট।

প্রসঙ্গত ক্যাগ গোটা দেশের জন্য একটা গড় মানদণ্ড স্থির করেছে হাইওয়ে তৈরির। মোটামুটিভাবে চার লেনের রাস্তার গড় খরচ সেটা। এখন মারাত্মক জ্যামপ্রবণ এলাকায় ছ'লেনের রাস্তা আর তার উপর আট লেনের টানা ফ্লাইওভারের এক্সপ্রেসওয়ে যে সেই টাকায় হবে না সেটা বলাই বাহুল্য। সূর্যবাবু চার লেনের রাস্তার খরচে হয়তো চোদ্দ লেনের (৬+৮) রাস্তা চাইছিলেন তাও ভুল হিসাব প্রচার করে।

ফেক নিউজ

কয়েক দিন আগে দেখা যায় কেউ বা কারা মহম্মদ দানিশ নামে এক তরুণের কপালে 'জয় ভোলানাথ' লিখে দিয়েছে। ঘটনার সাথে সাথে এক বিজেপি সমর্থক হিন্দুকে জড়িয়ে ফেক নিউজ ছড়িয়ে দেয় আম আদমি পার্টি থেকে শুরু করে অখিলেশের সমাজবাদী পার্টি। চেষ্টা করা হয় দাঙ্গা লাগানোর। যদি যোগী প্রশাসনের তৎপরতায় উত্তেজনা ছড়ানো যায়নি।

আসল খবর:

মহম্মদ দানিশ নামে ওই তরুণ আসলে মানসিকভাবে সুস্থ নয়। পরে প্রকাশ্যে আসে অপরাধীর নাম মহম্মদ শাদাব যে আদতে সমাজবাদী পার্টির সমর্থক। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যায়নি যে ঠিক একইভাবে আমরা দেখেছিলাম গত বছর দুর্গাপুজোতেও ঠিক একই রকমভাবে, সাজানো এবং মিথ্যে অভিযোগের কারণে জ্বলে উঠেছিল হিংসার আগুন। হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলে বেশ কয়েক দিন ধরে। যথারীতি হয়নি কোনও মোমবাতি মিছিল।

ফেক নিউজ

উদয়নিধি স্টালিন তামিলনাড়ুর মন্ত্রী এবং ডিএমকে প্রধান এমকে

স্টালিনের পুত্র। তিনি আগামী লোকসভায় মমতা ব্যানার্জির জোটসঙ্গীও। কিছুদিন আগে তিনি সনাতন ধর্মকে নিয়ে প্রকাশ্যে বলেন যে সনাতন ধর্মকে শেষ করে দেওয়াটাই তাদের লক্ষ্য। স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিবাদ আসে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও প্রতিবাদ করেন এই

মন্তব্যের। কিন্তু প্রকাশ্যে ভিডিও, ট্যুইট থাকার পরেও প্রধানমন্ত্রীকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা শুরু হয়। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া অব্দি ডিএমকে এবং তার জোটসঙ্গীরা ফেক নিউজ ছড়াতে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে।

আসল খবর:

শেষমেশ অবশ্য ঘরে বাইরে চাপে পড়ে পিছিয়ে যায় ডিএমকে এবং নিজেদের ভুল স্বীকার করার বদলে প্রধানমন্ত্রীকে অপদস্থ করার এই ঘৃণ্য চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থ করে দেয় আপামর জাতীয়তাবাদী জনতা।

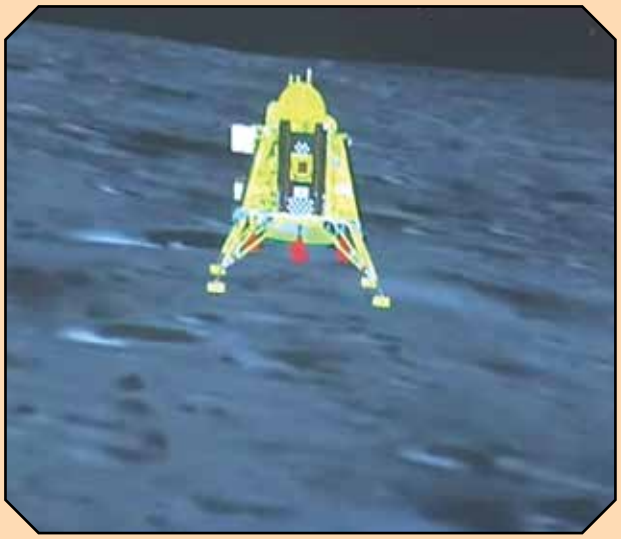

চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণের মুহূর্তে চন্দ্রযান-৩

চন্দ্রযান-৩-এর সফল অবতরণের পর দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সফররত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান সংস্থা ইসরো-র মহিলা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী।

দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনের মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ভারত মন্ডপমে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

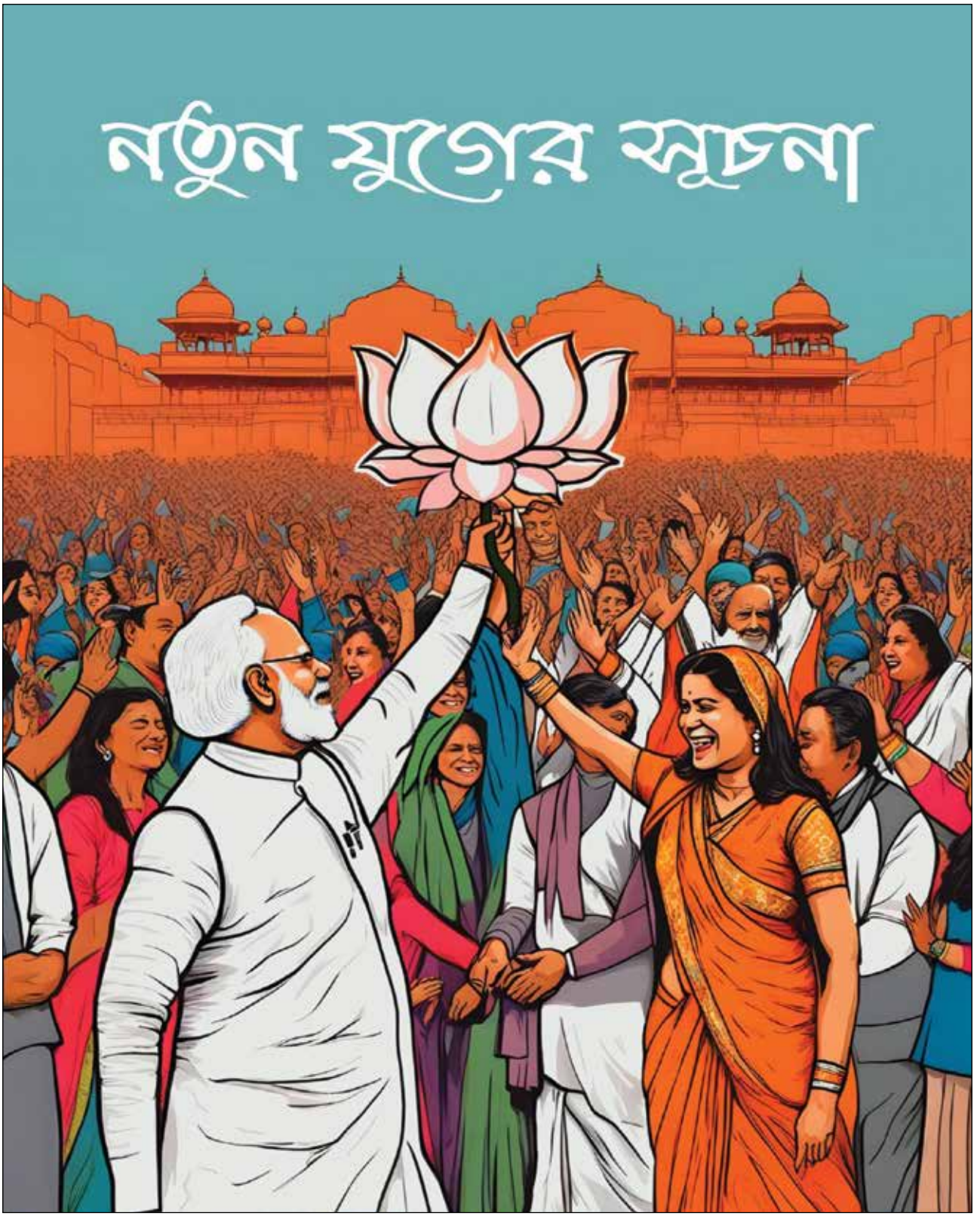

পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে স্থিতিশীল সরকার থাকার জন্যে
‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ মুরলীধর সেন লেন, কলকাতা - ৭০০০৭৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।